মাসিক

তর্জুমানুল হাদীস

مجلة ترجمان الحديث الشهرية

কুরআন-সুন্নাহর শাশ্বত বিধান, জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের অকুণ্ঠ প্রচারক

প্রতিষ্ঠাতা: আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)

৫ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা
জুলাই ২০২২ ঈসায়ী
যিলহজ্জ ১৪৪৩ হিজরী
আষাঢ়-শ্রাবণ ১৪২৯ বাংলা

কুরবানী

আল্লাহর নৈকট্য লাভের অন্যতম উপায়

تقبل الله منا ومنكم

ঐতিহাসিক আরাফা প্রান্তরের নামিরা মসজিদ

بسم الله الرحمن الرحيم

মাসিক

তর্জুমানুল হাদীস

مجلة ترجمان الحديث الشهرية

রেজি নং ডি.এ. ১৪২

مجلة البحوث العلمية الناطقة بلسان جمعية أهل الحديث ببنغلاديش

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের গবেষণামূলক মুখপত্র

কুরআন-সুন্নাহর শাশ্বত বিধান, জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের অকুণ্ঠ প্রচারক

৩য় পর্ব

৫ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা

জুলাই	২০২২ ঈসায়ী
যিলহজ্জ	১৪৪৩ হিজরী
আষাঢ়-শ্রাবণ	১৪২৯ বাংলা

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি

অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল্লাহ ফারুক

সম্পাদক

অধ্যাপক ড. আহমাদুল্লাহ ত্রিশালী

সহযোগী সম্পাদক

শাইখ মুফায্যল হুসাইন মাদানী

প্রবাস সম্পাদক

শাইখ মুহাম্মাদ আজমাল হুসাইন বিন আবদুর নূর

ব্যবস্থাপক

চৌধুরী মু'মিনুল ইসলাম

সহকারী ব্যবস্থাপক

মো: রমজান ভূঁইয়া

উপদেষ্টামণ্ডলী

প্রফেসর এ.কে.এম. শামসুল আলম
মুহাম্মদ রুহুল আমীন (সাবেক আইজিপি)
আলহাজ্জ মুহাম্মাদ আওলাদ হোসেন
প্রফেসর ডক্টর দেওয়ান আব্দুর রহীম
প্রফেসর ডক্টর মো. লোকমান হোসেন

সম্পাদনা পরিষদ

অধ্যাপক ডক্টর মুহাম্মাদ রঈসুদ্দীন
ডক্টর মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী
শাইখ মুহাম্মাদ হারুন হুসাইন
শাইখ আবদুল্লাহ বিন শাহেদ মাদানী
শাইখ আব্দুল্লাহিল কাফী মাদানী
শাইখ ইসহাক বিন ইরশাদ মাদানী

সম্পাদক
০১৭১৬-১০২৬৬৩
সহযোগী সম্পাদক
০১৭২০-১১৩১৮০
ব্যবস্থাপক :
০১৯১৬-৭০০৮৬৬

যোগাযোগ : মাসিক তর্জুমানুল হাদীস
৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা-১২০৪।
ফোন : ০২-৭৫৪২৪৪৩৪ মোবাইল : ০১৯৩৩-৩৫৫৯০৮
ই-মেইল : tarjumanulhadeethbd@gmail.com
www.jamiyat.org.bd
www.ahlahadith.net.bd
https://www.facebook.com/tarjumanulhadeeth/

সার্কুলেশন বিভাগ :
০১৯৩৩-৩৫৫৯০৮
বিকাশ :
০১৯৩৩-৩৫৫৯০৮

মূল্য : ২৫/- [পঁচিশ টাকা মাত্র]

মাসিক
তর্জুমানুল হাদীস
مجلة ترجمان الحديث الشهرية
রেজি নং ডি.এ. ১৪২
مجلة البحوث العلمية الناطقة بلسان جمعية أهل الحديث ببنغلاديش
বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের গবেষণামূলক মুখপত্র
কুরআন-সুন্নাহর শাশ্বত বিধান, জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের অকুণ্ঠ প্রচারক

تصدر من مكتب جمعية أهل الحديث بنغلاديش، ٩٨ شارع نواب فور، داكا- ١١٠٠ الهاتف : ٠٢٧٥٤٢٤٣٤، الجوال : ٠١٧١٦١٠٢٦٦٣
المؤسس: العلامة محمد عبد الله الكافي القريشي رحمه الله، المشرف العام للمجلة: الأستاذ الدكتور عبد الله فاروق، رئيس التحرير: الأستاذ الدكتور أحمد الله تريشالي، مساعد التحرير: الشيخ مفضل حسين المدني.

গ্রাহক ও এজেন্ট হওয়ার নিয়মাবলী

বছরের যে কোনো সময় গ্রাহক হওয়া যায়। ছয় মাসের কমে গ্রাহক করা হয় না। জেলা জমঈয়তের সুপারিশপত্রসহ প্রতি সংখ্যার জন্য অগ্রীম ৫০/- (পঞ্চাশ টাকা) পাঠিয়ে বছরের যে কোনো সময় এজেন্সি নেয়া যায়। ১০ কপির কমে এজেন্সি দেয়া হয় না। ১০-২৫ কপি পর্যন্ত ২০% ও ২৬-১০০ কপির জন্য ২৫% কমিশন দেয়া হয়। প্রত্যেক এজেন্টকে এক কপি সৌজন্য দেয়া হয়। জামানতের টাকা, পত্রিকা অফিসে নগদ অথবা "বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস" সঞ্চয়ী হিসাব নং- ২৮৫৬, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, নবাবপুর শাখা, ঢাকায় (অন-লাইনে) জমা দিয়ে এজেন্ট হওয়া যায়।

গ্রাহক চাঁদার হার (ডাকমাশুলসহ)

দেশ	বার্ষিক চাঁদার হার	ষান্মাষিক চাঁদার হার
বাংলাদেশ	৩৬০/-	১৮০/-
পাকিস্তান, ভারত, নেপাল, ভুটান, শ্রীলঙ্কা ও মায়ানমার	২০ ইউ.এস. ডলার	১০ ইউ.এস. ডলার
সাউদী আবর, ইরাক, ইরান, কুয়েতসহ মধ্য প্রাচ্যের দেশসমূহ ও সিঙ্গাপুর	২৫ ইউ.এস. ডলার	১২ ইউ.এস. ডলার
ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ব্রুনাইসহ এশিয়ার অন্যান্য দেশসমূহ	২২ইউ.এস. ডলার	১১উ.এস. ডলার
আমেরিকা, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড সহ পশ্চিমা দেশসমূহ	৩৫ ইউ.এস. ডলার	১৮ ইউ.এস. ডলার
ইউরোপ ও আফ্রিকা	৩০ ইউ.এস.ডলার	১৫ ইউ.এস. ডলার

বিজ্ঞাপনের হার

শেষ প্রচ্ছদ পূর্ণ পৃষ্ঠা	১০, ০০০/-
শেষ প্রচ্ছদ অর্ধ পৃষ্ঠা	৬০০০/-
৩য় প্রচ্ছদ পূর্ণ পৃষ্ঠা	৭০০০/-
৩য় প্রচ্ছদ অর্ধ পৃষ্ঠা	৪০০০/-
সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা	৪০০০/-
সাধারণ অর্ধ পৃষ্ঠা	২৫০০/-
সাধারণ সিকি পৃষ্ঠা	১২০০/-

সূচীপত্র

দারসুল কুরআন
- কুরবানীর তাৎপর্য ও শিক্ষা.....০৩
  ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী

দারসুল হাদীস
- কুরবানী ও উহার ফযীলত.....০৮
  শাইখ মোঃ ঈসা মিঞা

সম্পাদকীয়
- যিলহজ্জ মাসের প্রথম ১০ দিন, আরাফা দিবস, হজ্জ ও ঈদুল আযহাঃ বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলের বানভাসী মানুষের কষ্ট; আমাদের করণীয়.....১৩

প্রবন্ধ :
- ইমাম সিদ্দীক হাসান খাঁন ভূপালী (রাহিমাহুল্লাহ) এবং তাওহীদ ও আকীদাহ.....১৪
  ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী
- কুরআন-সুন্নাহর আলোকে চিন্তা ও বিষন্নতা ১৭
  মুহাম্মদ আব্দুল্লাহিল কাফী
- দাওয়াতে দ্বীনের পদ্ধতি ও রূপরেখা..... ১৯
  শাইখ আবদুল মু'মিন বিন আবদুল খালিক
- আমরা রাসূল (সা:)-কে ভালোবাসবো কীভাবে.....২২
  আব্দুল্লাহ আরমান বিন রফিক
- আমি প্রবাসী.....২৮
  ইয়াছিন মাহমুদ বিন আরশাদ
- দৃষ্টিনন্দন প্রাসাদ.....৩০
  সাইদুর রহমান

শুব্বান পাতা
- নবুওত ও আমাদের কর্তব্য ৩৫
  সাব্বির রায়হান বিন আহসান হাবিব
- ইমামের মর্যাদা ৩৮
  শাহিদুল ইসলাম বিন সুলতান
- আত্মহত্যা প্রতিকারে ইসলাম.....৪১
  এ.এস.এম.মাহবুবুর রহমান
- ফাতাওয়া ও মাসায়েল.....৪৪
- আমাদের আহ্বান ৪৮

দারসুল কুরআন/ من دروس القرآن

কুরবানীর তাৎপর্য ও শিক্ষা

ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী❖

আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ

﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَٰلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾

আয়াতসমূহের সরল অনুবাদঃ

আল্লাহ তা'আলা বলেন: "আমি প্রত্যেক উম্মাতের জন্য কুরবানীর নিয়ম করেছি, যাতে তারা আল্লাহর দেয়া চতুষ্পদ জন্তু যবেহ করার সময় আল্লাহর নাম স্মরণ করে। তোমাদের প্রকৃত মাবুদ মাত্র একজনই, সুতরাং তোমরা তাঁরই নিকট আত্মসমর্পণ কর। আর বিনয়ীগণকে সুসংবাদ দাও। যাদের অন্তর আল্লাহর নাম স্মরণ করা হলে ভয়ে কেঁপে ওঠে এবং যারা তাদের বিপদাপদে ধৈর্যধারণ করে এবং যারা সালাত কায়েম করে ও আমি যা দিয়েছি তা হতে ব্যয় করে। এবং (কুরবানীর পশু) উটকে আমি তোমাদের জন্য আল্লাহর অন্যতম নিদর্শন করে দিয়েছি। এতে তোমাদের জন্যে মঙ্গল রয়েছে। সুতরাং সারিবদ্ধভাবে বাঁধা অবস্থায় যবেহ করার সময় তোমরা আল্লাহর নাম স্মরণ কর। অতঃপর যখন (পশুরা) কাত হয়ে পড়ে যায় তখন তা থেকে তোমরা আহার কর এবং করাও ধৈর্যশীল অভাবগ্রস্ত ও ভিখাকারী অভাবগ্রস্তকে। এমনভাবে আমি এ (পশু) গুলোকে তোমাদের বশীভূত করে দিয়েছি, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।"[১]

আয়াতসমূহ অবতরণের প্রেক্ষাপট ঃ

আলোচ্য আয়াতসমূহ অবতরণের কোন উল্লেখযোগ্য প্রেক্ষাপট বিশুদ্ধ সূত্রে জানা যায়নি, তবে আয়াতগুলোর আলোচ্য বিষয় হতে প্রতীয়মান হয় যে, কুরবানীর বিধি-বিধান ও গুরুত্ব তাৎপর্যকে কেন্দ্র করেই এসব আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে।

আয়াতসমূহের আলোচ্য বিষয় ঃ

উল্লেখিত আয়াতসমূহের ভাবার্থের দিকে লক্ষ্য করলে বলা যেতে পারে যে, আলোচ্য আয়াতসমূহ কুরবানীর বিধিবিধানের এক উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। এতে আলোচনা করা হয়েছে প্রতিটি জাতির জন্য কুরবানীর বিধান প্রবর্তনের কথা। আরো আলোচনা করা হয়েছে- কুরবানীর মূল উদ্দেশ্য হলো আল্লাহকে স্মরণ করা এবং তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করা, এর সাথেই সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে বিনয়ীগণকে এবং তাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোকপাত করা হয়েছে। শেষ আয়াতটিতে কুরবানীর পশু যবেহের সময় আল্লাহর নাম স্মরণ করা এবং কারা কারা এ পশুর গোশত ভক্ষণের অধিকার রাখে ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করা হয়েছে।

কুরবানীর গুরুত্ব ও তাৎপর্য ঃ

কুরবানী ইসলামী শরীয়তে একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত, এমনকি এ ইবাদত সঠিক নিয়ম ও পদ্ধতিতে এক আল্লাহ তা'আলার জন্য সম্পাদন করলে তা তাওহীদ প্রতিষ্ঠার এক অন্যতম কর্ম হিসাবে গণ্য হবে, অপরপক্ষে ইহা আল্লাহ ছাড়া গাইরুল্লাহর সন্তুষ্টি বা উদ্দেশ্যে সম্পাদন করা হলে তা শির্কে আকবারে পরিণত হবে। এবং কুরবানী সম্পাদনকারী ইসলামের গন্ডি হতে বের হয়ে কাফির মুশরিক বনে যাবে। (নাউযুবিল্লাহ)। সুতরাং কুরবানীর গুরুত্ব ও তাৎপর্যকে ছোট করে দেখার কোন সুযোগ নেই।

মানব জাতির শুরু হতেই এ কুরবানীর প্রচলন শুরু হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

﴿وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِن أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾

❖ *সেক্রেটারী জেনারেল- বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস।*

[১] *সূরা আল হাজ্জ আয়াত: ৩৪-৩৬*

"আপনি তাদেরকে আদামের দুই সন্তানের সংবাদ সঠিকভাবে পাঠ করে শোনান, যখন তারা দু'জনে কুরবানী করেছিল, তখন তাদের একজনের কুরবানী গ্রহণযোগ্য হল আর অপরজনের কুরবানী গ্রহণযোগ্য হল না ...।"[২]

এভাবেই আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য অর্জনের এ মহতি ইবাদত কুরবানী যুগে যুগে সকল জাতির মাঝে বিদ্যমান ছিল। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ﴾

"আমি প্রত্যেক উম্মাতের জন্যে কুরবানীর নিয়ম করেছি, যাতে তারা আল্লাহর দেয়া চতুষ্পদ জন্তু যবেহ করার সময় আল্লাহর নাম স্মরণ করে।

তোমাদের প্রকৃত মা'বুদ মাত্র একজনই, সুতরাং তোমরা তারই নিকট আত্মসমর্পণ কর। আর বিনয়ীদের সুসংবাদ দাও।"[৩] এভাবেই প্রতিটি জাতির মধ্যে কুরবানীর বিধান চলতে থাকে, পর্যায়ক্রমে শুরু হয় আবুল আম্বিয়া ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-এর যুগ। আল্লাহ রব্বুল আলামীন ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-কেও একই নির্দেশ দিলেন বরং আরো কঠোর পরীক্ষার সম্মুখীন করলেন, নির্দেশ দিলেন কলিজার টুকরা প্রাণ-প্রিয় সন্তান ইসমাঈলকে কুরবানী করার। কিন্তু আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের জন্য আল্লাহর নির্দেশ পালনে অপেক্ষা মাত্র নির্দেশের। নির্দেশ হওয়া মাত্রই তা কার্যকর হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

﴿فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ﴾

"দু'জনই যখন আনুগত্যে আত্মসমর্পণ করলেন এবং ইবরাহীম আলাইহিস সালাম তাকে উপুড় করে শুইয়ে দিলেন তখন আমি তাঁকে ডাক দিলাম হে ইবরাহীম! স্বপ্নে দেয়া আদেশ তুমি সত্যে পরিণত করেছ, এভাবেই আমি সৎ কর্মশীলদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি। অবশ্যই এটা ছিল এক সুস্পষ্ট পরীক্ষা। আমি এক মহান কুরবানীর বিনিময়ে তাকে (পুত্রকে) ছাড়িয়ে নিলাম।"[৪]

মুসলিম জাতির দ্বীনী পিতা ইবরাহীম আলাইহিস সালাম মূলতঃ সন্তান কুরবানীর নির্দেশপ্রাপ্ত হয়েছিলেন এবং তা বাস্তবায়নও করেছেন। তাঁদের এ পূর্ণ আনুগত্যের বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা সন্তানকে অক্ষত রেখে পশু কুরবানীতে রূপদান করলেন এবং সে বিধানই তাঁর সন্তানদের মাঝে পরবর্তীতে চালু রাখলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলেও সত্য যে, সে কুরবানী আজ আল্লাহর আনুগত্যের পরিবর্তে প্রশংসা কামানো এবং গোশত খাওয়ার উৎসবে পরিণত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ইসলামের প্রতিটি ইবাদাতের মাঝে দু'টি বিষয় নিহিত রেখেছেন: (এক) উক্ত ইবাদত সঠিকভাবে পালনের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য অর্জন করা। (দুই) এ ইবাদত থেকে শিক্ষাগ্রহণ করে নিজের ঈমান ইসলাম ও জীবনাদর্শকে আরো সুন্দর ও সক্রিয় করা। হে মুসলিম সমাজ! আসুন, আমরা কুরবানী ইবাদত হতে আমাদের শিক্ষণীয় বিষয়গুলো জেনে নিই।

কুরবানীর শিক্ষা ঃ

কুরবানী একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত, যার মাধ্যমে আল্লাহর সাথে মানুষের গভীর সম্পর্ক গড়ে তোলা সম্ভব, আরো সম্ভব এ ইবাদত হতে শিক্ষা গ্রহণ করে নিজের ঈমান ও ইসলামকে পরিশুদ্ধ করা। কুরবানীর শিক্ষা নানাবিধ- তন্মধ্যে উল্লোখযোগ্য কয়েকটি শিক্ষা নিম্নে প্রদত্ত হল ঃ

১। তাওহীদ প্রতিষ্ঠায় কুরবানী ঃ

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ ﴿فصل لربك وانحر﴾ "অতঃপর তোমার রবের জন্য সালাত সম্পাদন কর এবং কুরবানী কর"।[৫] অন্যত্র আল্লাহ বলেন ঃ

﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾

"আমি প্রত্যেক উম্মাতের জন্য কুরবানীর নিয়ম করেছি যাতে তারা আল্লাহর দেয়া চতুষ্পদ জন্তু যবেহ করার সময় আল্লাহর নাম স্মরণ করে।"[৬]

[২] *সূরা আল মায়িদাহ আয়াত: ২৭*
[৩] *সূরা আল হাজ্জ আয়াত: ৩৪*
[৪] *সূরা আস সফ্ফাত আয়াত: ১০৩-১০৭*
[৫] *সূরা আল কাউসার আয়াত: ২*

এছাড়াও এ বিষয়ে একাধিক আয়াত এসেছে যা প্রমাণ করে যে, এ কুরবানী হবে একমাত্র আল্লাহ তাআলার নামেই এবং তাঁর জন্যই। যেমন ঃ

﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾

"বলুন আমার সালাত, আমার কুরবানী এবং আমার জীবন মরণ সবকিছুই বিশ্বজগতের প্রতিপালক মহান আল্লাহ তা'আলার জন্য, তাঁর কোন শরীক নেই।"[৭]

সুতরাং মহান আল্লাহর তাওহীদ একত্ববাদ প্রতিষ্ঠায় কুরবানী একটি উল্লেখযোগ্য ইবাদত, কিন্তু দুঃখের বিষয় কতক নামধারী মুসলমান আল্লাহর প্রতি ঈমানের দাবীদার হওয়া সত্ত্বেও পীর, ফকির, কবর, মাযার ওরস ইত্যাদিতে গাইরুল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে ঈদুল আযহার দিনের চেয়েও শবে বরাত, শবে মিরাজ, জন্মবার্ষিকী ও মৃত্যুবার্ষিকী ইত্যাদি বিভিন্ন উপলক্ষে অসংখ্য কুরবানী করে চলেছে। অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ

« لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ »

যে ব্যক্তি গাইরুল্লাহর উদ্দেশে কুরবানী করে তার ওপর আল্লাহর লা'নত।"[৮] আশ্চর্যের বিষয় হলো, একজন মানুষ ইবাদাতের কাজ করতে গিয়ে লানতপ্রাপ্ত হয়ে ফিরে আসে। আল্লাহর সন্তুষ্টির পরিবর্তে ক্রোধ অর্জন করে।

অতএব প্রতিটি মুমিন মুসলিমের কুরবানী হতে শিক্ষা গ্রহণ করে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করে তাওহীদ প্রতিষ্ঠার পথ বেছে নিয়ে জান্নাতের পথে অগ্রসর হওয়া উচিত, আল্লাহ আমাদের তাওফীক দান করুন। আমীন

২। রাসূল ﷺ-এর অনুসরণে কুরবানী ঃ

কুরবানী ইসলামের রোকন বা কোন ফরয ইবাদত না হলেও তা পালনে মানুষের মাঝে বেশ উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়, এমনকি বলা যেতে পারে যে, ইসলামের অন্যতম ইবাদত ঈমানের পরেই সবচেয়ে বড় রোকন সালাত কায়েমেও যতটুকু যত্নশীল নয় তারচেয়েও বেশি উৎসাহ কুরবানী পালনে। তাইতো দেখা যায়, যারা গোটা বছর সালাতের ধারে কাছে নেই ঈদের নামাযে তাদেরই ভিড় বেশি এবং কুরবানীর বড় পশু ক্রয়ের প্রতিযোগিতা তাদের মাঝেই। মানুষ এ কুরবানী ইবাদতটি সম্পাদনে যথেষ্ট গুরুত্বশীল, এ কুরবানী সুষ্ঠুভাবে পালনের জন্য নবী ﷺ-এর নির্দেশনা অনুশীলনেও সচেষ্ট, যেমন পশুটি কুরবানীর উপযুক্ত হওয়ার জন্য যেসব বৈশিষ্ট্য প্রয়োজন তা ভালভাবে লক্ষ্য করা হয়। অনুরূপ কুরবানী যবেহ করার সময় সম্পর্কেও খুব গুরুত্ব দেয়া হয়। হাদীসে এসেছে ঃ

সাহাবী বারা رضي الله عنه বর্ণনা করেন, তিনি বলেন ঃ

« إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا نُصَلِّي ثُمَّ نَرْجِعُ فَنَنْحَرُ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا وَمَنْ ذَبَحَ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لأَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ ».

"আমরা আমাদের এই (ঈদুল আযহার) দিনে সর্ব প্রথম ঈদের সালাত আদায় করব অতঃপর বাড়ীতে ফিরে কুরবানী করব। যে ব্যক্তি এরূপ করবে সে সুন্নাত মোতাবেক কুরবানী করল আর যে (ঈদের নামাযের) পূর্বে কুরবানী করল সে যেন শুধু পরিবারের গোশত খাওয়ার ব্যবস্থা করল, উহা তার কুরবানী বলে গণ্য হবে না।[৯]

নাবী ﷺ-এর নির্দেশ মোতাবেক প্রতিটি মানুষই কুরবানীর ঈদের সালাত সম্পাদন করার পর কুরবানীর পশু যবেহ করে। কুরবানী নষ্ট হয়ে যেতে পারে এ ভয়ে কেউ ঈদের সালাতের পূর্বে কুরবানী করে না; সকলেই নবী ﷺ-এর বেঁধে দেয়া সময়সীমা অনুসরণে পূর্ণ সতর্কতার সাথে তা পালনে সচেষ্ট, মুসলিম সমাজের কাছে প্রশ্ন, নবী ﷺ-এর অনুসরণ কি শুধু কুরবানীতে সীমাবদ্ধ, না ইসলামের প্রতিটি ইবাদাতে? সকলেই একবাক্যে উত্তর দিবেন যে, নবী ﷺ-এর অনুসরণ ইসলামের প্রতিটি ইবাদাতের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রাসূলের অনুসরণ কর, আর তোমাদের আমল সমূহ বাতিল করো না।[১০]

---

[৬] *সূরা আল হাজ্জ আয়াত: ৩৪*
[৭] *সূরা আল আনআম আয়াত: ১৬২*
[৮] *সহীহ মুসলিম হা: ৫২৪০*
[৯] *সহীহ মুসলিম হা: ১৫৫৩*
[১০] *সূরা মুহাম্মাদ আয়াত: ৩৩*

অতএব কুরবানী আমাদের জন্য রাসূল ﷺ-এর অনুসরণের এক বাস্তব নমুনা, যা আমাদের শিক্ষা দেয় যে, ইসলামের প্রতিটি ইবাদত তাঁর দেয়া নির্দেশ অনুযায়ী পালন করতে হবে। অন্য কোন মত ও পথ বা খেয়ালখুশি মতো করলে তা কুরবানীর মতই বাতিল ইবাদত বলে গণ্য হবে। নবী ﷺ বলেন ঃ

« مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ »

"যে ব্যক্তি এমন কোন আমল/ইবাদত করল যে ব্যাপারে আমাদের কোন নির্দেশনা নেই তা প্রত্যাখ্যানযোগ্য।"[১১]

সুতরাং কুরবানী আমাদের শিক্ষা দেয় যে, আমাদের ঈমান আমল, সালাত যাকাত, সিয়াম, কিয়াম ইত্যাদি সকল ইবাদত আল্লাহ তা'আলার কাছে গ্রহণযোগ্য হতে হলে বিশুদ্ধ সূত্রে প্রমাণিত রাসূল ﷺ-এর বেঁধে দেয়া সময়সীমা ও নিয়ম নীতির আলোকে সম্পাদন করতে হবে। আল্লাহ আমাদের সেই হেদায়াত দান করুন। আমীন!

৩। তাকওয়া প্রতিষ্ঠায় কুরবানী ঃ

যেসব উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে কুরবানীর বিধান প্রবর্তন হয়েছে তন্মধ্যে অন্যতম হলো তাকওয়া প্রতিষ্ঠা করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ

"আল্লাহর কাছে পৌঁছে না ওসবের (কুরবানীর) গোশত ও রক্ত বরং তার কাছে পৌঁছে তোমাদের তাকওয়া ।"[১২]

জাহেলী যুগের নির্বোধ সমাজ কুরবানী করার পর কেউ তাদের প্রতিমার গায়ে রক্ত মাংস মেখে দিত, আবার কেউ কা'বা গৃহের দেয়ালে কুরবানীর রক্ত মেখে দিত।[১৩] কিন্তু আল্লাহ তা'আলা সে রক্ত মাংস চান না,বরং তিনি চান আমাদের তাকওয়া-আল্লাহভীতি ও সংযম, কিন্তু দুঃখের বিষয় হলেও সত্য যে, আজ আমরা কুরবানীর মাধ্যমে তাকওয়া প্রদর্শনের চেয়ে বাহ্যিক চাকচিক্য ও রক্ত গোশত প্রদর্শনই মুখ্য উদ্দেশ্য মনে করছি। অবশ্য কুরবানীর পশু সুন্দর ও আকর্ষণীয় হওয়ার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে, ইহা মূলতঃ মানুষের হীনভাবকে দূর করার জন্যই, কারণ কুরবানীর পশুর ক্ষেত্রে ঐসব গুণাবলীসম্পন্ন হওয়া শর্ত করা না হলে সদকা বা মানতের ছাগলের মতই এর অবস্থা হতো। যত রকমের ছোট ও কম মূল্যের প্রাণীই বেশি সংখ্যক মানুষ কুরবানীর জন্য নির্ধারণ করত। অতএব ঐসব শর্ত থাকা মানে বাহ্যিক চাকচিক্য উদ্দেশ্য নয়, বরং মূল উদ্দেশ্য হল অন্তরের তাকওয়া। এজন্যই আল্লাহ বলেন, إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ "আল্লাহ তা'আলা শুধুমাত্র সংযমশীল তাকওয়াবানদের থেকেই (কুরবানী) কবুল করেন।"[১৪]

অতএব কুরবানী আমাদেরকে তাকওয়ার শিক্ষাই দিয়ে যাচ্ছে। আসুন আমরা মুত্তাকি হওয়ার চেষ্টা করি।

৪। আত্মত্যাগে কুরবানী ঃ

মানুষ পার্থিব মোহে মোহিত হয়ে ছুটছে প্রাচুর্য ও আধিক্যের টানে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ (أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ) "প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে ব্যাস্ত করে রেখেছে।"[১৫]

মানুষের জানমাল খুবই মূল্যবান, এসবের ত্যাগ স্বীকার করা যেন অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। মনে হয় পার্থিব জীবনই আমাদের শেষ ঠিকানা, তাই কীভাবে এ ভবের সংসার গড়া যায় সে প্রতিযোগিতাই সারাক্ষণ। কিন্তু না, না, তা না, ঐ দীর্ঘ দিনের পালিত মায়াময় পশুটি অথবা কষ্টার্জিত অর্থে খরিদ করা আকর্ষণীয় পশুটিকে যখন স্বহস্তে ধারাল ছুরি দিয়ে কঠিন হৃদয়ে "বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার" বলে যবেহ করি, আর পশুটি মাটিতে হাত-পা চাপড়াতে চাপড়াতে নিস্প্রাণ হয়ে যায় এ দৃশ্য বলে দিচ্ছে যে, শুধু পশুটি নয় বরং এ পৃথিবীর সবকিছুই নশ্বর। আল্লাহ বলেন ঃ

﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ﴾

"জীব মাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে, অতঃপর তোমরা আমারই নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে।"[১৬]

তাইতো আমাদের দ্বীনী পিতা ইবরাহীম আলাইহিস সালাম আল্লাহর নির্দেশ পাওয়ার সাথে সাথেই আত্মত্যাগ শুধু নয় বরং সর্বস্ব ত্যাগে প্রস্তুত হয়ে গেলেন। আল্লাহ বলেন ঃ

[১১] *সহীহ মুসলিম হা: ৪৫৯০*
[১২] *সূরা আল হাজ্জ আয়াত: ৩৭*
[১৩] *ইবনু কাসীর ৩/২৪৭*
[১৪] *সূরা আল মায়িদাহ আয়াত: ২৭*
[১৫] *সূরা আত তাকাসুর আয়াত: ১*
[১৬] *সূরা আল আনকাবুত আয়াত: ৫৭*

﴿فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾

"(ইবরাহীম ও ইসমাঈল) দু'জনই যখন আনুগত্যে আত্মসমর্পণ করলেন এবং ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) তাকে উপুড় করে শুইয়ে দিলেন, তখন আমি তাঁকে ডাক দিলাম, হে ইবরাহীম! স্বপ্নে দেয়া আদেশ তুমি সত্যে পরিণত করেছ।"[১৭]

আমাদের ঈদের কুরবানী সেখান থেকেই এসেছে, এ কুরবানী সে আত্মত্যাগের কথাই শিক্ষা দিয়ে যাচ্ছে, আসুন আমরা আল্লাহর নির্দেশ পালনে দীনের স্বার্থে আত্মত্যাগে সচেষ্ট হই।

৫। প্রতিবেশী ও দরিদ্রের অধিকার প্রদানে কুরবানী ঃ

মানুষ সামাজিক জীব। একাকী জীবনযাপন করতে পারে না, বরং অপরের সহযোগিতার প্রয়োজন হয়, কিন্তু কোন ব্যক্তি যখন স্বচ্ছল হয় তখন অপরকে ভুলে যায়, নিজের সুখ শান্তি নিয়েই ব্যস্ত থাকে, অপরের দুঃখ-দুর্দশার কথা ভুলে যায়। কিন্তু ইসলাম এক আদর্শ জীবন বিধান। 'চাচা আপন প্রাণ বাঁচা' পদ্ধতিকে কখনও সমর্থন করে না, বরং পরোপকারকেই বড় করে দেখেছে, এমনকি প্রতিবেশীর অধিকার প্রদানকে ঈমানের এক বড় অংশ বানিয়ে দিয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

﴿وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾

"পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ কর এবং আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম-দরিদ্র, নিকটতম ও দূরবর্তী প্রতিবেশী এবং পথিক ও অধীনস্থ দাস-দাসীর প্রতি সদাচরণ কর।"[১৮]

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন ঃ "জিবরাইল (আলাইহিস সালাম) আমাকে সর্বদা প্রতিবেশীর প্রতি সদাচরণের উপদেশ দেন, এমনকি আমার মনে হয় তিনি যেন প্রতিবেশীকে ওয়ারিশ বানিয়ে ফেলবেন।[১৯]

নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরো বলেন ঃ

« مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُحْسِنْ إِلَى جَارِهِ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ ».

"যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে সে যেন স্বীয় প্রতিবেশীর প্রতি সদাচরণ করে এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে সে যেন স্বীয় আত্মীয় স্বজনের প্রতি সম্মান দেখায়।[২০]

অতএব প্রতিবেশী ও আত্মীয় স্বজনের অধিকার প্রদান ঈমানের এক বৃহৎ অংশ হওয়া সত্ত্বেও মানুষ তা প্রদানে খুবই কৃপণ, কিন্তু কুরবানী আমাদের সেই মহান দায়িত্ব পালনের কথাই শিক্ষা দিয়ে যায়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ﴾

"তোমরা উহা (কুরবানীর গোশত) হতে খাও এবং সংযমী দরিদ্র ও ভিখাকারী অভাবীকে খাওয়াও।"[২১]

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন ঃ "তোমরা খাও, সঞ্চয় করে রাখ এবং দান কর।"[২২] গরীব মিসকিনদেরকে খাওয়াবে। সুতরাং কুরবানী আমাদেরকে প্রতিবেশী ও দরিদ্রের অধিকার প্রদানে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা দান করে, আল্লাহ আমাদের সর্বদাই প্রতিবেশী ও দরিদ্রের যথাযথ অধিকার প্রদানে সচেষ্ট হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন

পরিশেষে আমরা বলতে পারি, কুরবানী এমন একটি তাৎপর্যপূর্ণ ইবাদত যার মাধ্যমে মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভ করার সাথে সাথে তাঁর তাওহীদ প্রতিষ্ঠা, সুন্নাতে রাসূলের একচ্ছত্র অনুসরণ এবং ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে ইসলামী অনুশীলনের বাস্তব শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি। আল্লাহ আমাদের কুরবানী পালনের মাধ্যমে পূর্ণ সফলতা অর্জন করার তাওফীক দান করুন। আমীন! ▣▣

---

[১৭] *সূরা আস সফ্ফাত আয়াত: ১০৩-১০৫*
[১৮] *সূরা আন নিসা আয়াত: ৩৬*
[১৯] *সহীহ বুখারী হা: ৬০১৪, সহীহ মুসলিম হা: ২৬২৪*
[২০] *সহীহ বুখারী ও মুসলিম হা: ১৮৫*
[২১] *সূরা আল হাজ্জ আয়াত: ৩৭*
[২২] *সহীহ বুখারী হা: ৫৫৭০, সহীহ মুসলিম হা: ১৯৭১*

দারসুল হাদীস/من أحاديث الرسول

কুরবানী ও উহার ফযীলত

শাইখ মোঃ ঈসা মিঞা❖

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ «إِذَا أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ، اشْتَرَى كَبْشَيْنِ عَظِيمَيْنِ، سَمِينَيْنِ، أَقْرَنَيْنِ، أَمْلَحَيْنِ مَوْجُوءَيْنِ، فَذَبَحَ أَحَدَهُمَا عَنْ أُمَّتِهِ، لِمَنْ شَهِدَ لِلَّهِ، بِالتَّوْحِيدِ، وَشَهِدَ لَهُ بِالْبَلَاغِ، وَذَبَحَ الْآخَرَ عَنْ مُحَمَّدٍ، وَعَنْ آلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

হাদীসের অনুবাদ:

আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন কুরবানী করার ইচ্ছা করতেন তখন দুটি মোটাতাজা মাংসল, শিংযুক্ত ধুসর বর্ণের খাসিকরা মেষ ক্রয় করতেন। অতঃপর এর একটি নিজ উম্মাতের মধ্যে যারা আল্লাহর একত্বের সাক্ষ্য দেয় এবং তাঁর নবুয়াতের সাক্ষ্য দেয় তাদের পক্ষ হতে এবং অপরটি মুহাম্মাদ ﷺ ও তাঁর পরিবার বর্গের পক্ষ থেকে কুরবানী করতেন।[২৩]

হাদীসের ব্যাখ্যা:

إِذَا أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ যখন তিনি কুরবানী করার ইচ্ছা করতেন। আরবী أضحية শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো, পশু যবেহ করা। ইসলামী শরীয়াতের পরিভাষায় أضحية ঐ পশুকে বলা হয় যা ঈদুল আযহার দিনে আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের উদ্দেশে যবেহ করা হয়।

কুরবানীর হুকুম:

আলিমগণের মাঝে কুরবানীর হুকুম নিয়ে দ্বিমত পরিলক্ষিত হলেও অধিকাংশ আলিমের মতে তা ওয়াজিব নয়, বরং তা সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ। এদের মধ্যে রয়েছেন ইমাম মালিক, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমাদ, ইসহাক, আবূ সওর, মুযানী, ইবনুল মুন্‌যির, দাউদ ও ইবনু হযম প্রমুখ ইমামগণ।

তাদের দলীল নিম্নরূপ: (১) সাহাবাগণ হতে বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত হয়েছে যে, কুরবানী ওয়াজিব নয়। কোনো সাহাবী হতে তা ওয়াজিব হওয়ার বিশুদ্ধ বর্ণনা পাওয়া যায় না।

ইমাম মাওয়ারদী বলেন: সাহাবাগণ হতে কুরবানী ওয়াজিব না হওয়া সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে তা ইজমার পর্যায়ে পৌঁছে। তন্মধ্য হতে কিছু বর্ণনা:

(ক) আবূ সারীহাহ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি আবূ বকর (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) ও উমার (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-কে দেখেছি যে, তারা কুরবানী করেননি।[২৪] (খ) আবূ মাসউদ আনসারী (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও আমি কুরবানী করা পরিত্যাগ করি এ আশঙ্কায় যে, আমার প্রতিবেশীগণ মনে করবে যে, তা আমার জন্য আবশ্যক (ওয়াজিব)।[২৫]

কুরবানীর পশু:

সকল আলিম এ বিষয়ে একমত যে, উট, গরু, ছাগল ও ভেড়া দ্বারা কুরবানী চলবে। দলীল আল্লাহ তা'আলার বাণী:

﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾

আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য কুরবানীর নিয়ম করে দিয়েছি যাতে আমি তাদেরকে জীবনোপকরণ স্বরূপ যেসব চতুষ্পদ জন্তু দিয়েছি সেগুলোর ওপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে। [২৬]

নাবী ﷺ হতে এমন কোনো বিশুদ্ধ বর্ণনা পাওয়া যায় না যে, তিনি উট, গরু, ছাগল ও ভেড়া ব্যতীত কুরবানী করেছেন অথবা কাউকে এ ছাড়া অন্য কোনো পশু দ্বারা কুরবানী করার অনুমতি দিয়েছেন। অতএব কুরবানীর

❖ *মুহাদ্দিস, মাদরাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়া, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।*

[২৩] *ইবনু মাজাহ হা: ৩১২২*

[২৪] *মুসনাদ আ: রায্‌যাক হা: ৮১৩৯, বায়হাকী- ৯/২৮৯*

[২৫] *মুসনাদ আ: রায্‌যাক হা: ৮১৪৯, বায়হাকী ৯/২৬৫*

[২৬] *সূরা আল হাজ্জ আয়াত: ৩৪*

পশু উল্লেখিত চার প্রকার প্রাণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। যদিও পরবর্তী যুগের কোনো কোনো আলিম মহিষ দ্বারা কুরবানী করা বৈধ বলে মত ব্যক্ত করেছেন।

কুরবানীর পশুর বয়স: নাবী ﷺ বলেন:

«لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم، فتذبحوا جذعة من الضأن»

তোমরা মুসিন্নাহ ব্যতীত কোনো পশু যবেহ (কুরবানী) করবে না। তবে মুসিন্নাহ সংগ্রহ করা অসম্ভব হলে ভেড়া মুসিন্নাহ ব্যতীতই কুরবানী করবে।[২৭] মুসিন্নাহ ঐ পশুকে বলা হয় যার দুধ দাত পড়ে গিয়ে নতুন দাঁত গজিয়েছে, যাকে আমরা সাধারণত দাঁতিল বলে থাকি। অতএব কুরবানীর পশু দাঁতিল হবে, আর ভেড়ার ক্ষেত্রে জাযাআহ (আদাঁতিল) কুরবানীর অনুমতি দিয়েছেন দাঁতিল পশু সংগ্রহ করা অসাধ্য হয়ে গেলে। সাধারণত ছাগল ১ বৎসর পূর্ণ হলে, গরু দুই বছর পূর্ণ হলে এবং উট পাঁচ বছর পূর্ণ হলে দাঁতিল হয়ে থাকে। পশুর দাঁতিল হওয়ার বয়স হয়েছে কিন্তু দাঁতিল হয়নি তাহলে কী করবে? এক্ষেত্রে রাসূল ﷺ-এর নির্দেশ হলো তোমরা মুসিন্নাহ (দাঁতিল) ছাড়া কুরবানী করবে না। অতএব বয়স মূল বিষয় নয়। দাঁতিল হওয়াই মূল বিষয়। দাঁতিল পশু সংগ্রহ করার চেষ্টা করে তা সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হলে এবং আদাঁতিল ভেড়াও না পাওয়া গেলে সে ক্ষেত্রে বয়সের বিবেচনায় কুরবানী করা যেতে পারে। আল্লাহই ভালো জানেন।

ভাগে কুরবানী:

সকল আলিম এ বিষয়ে একমত যে, ছাগল ও ভেড়া ভাগে কুরবানী চলবে না। তবে পরিবারের সদস্য সংখ্যা যতই হোক পরিবারের পক্ষ থেকে একটি ছাগলই যথেষ্ট। দলীল:

عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد، ويبرك في سواد، وينظر في سواد، فأتي به ليضحي به، فقال لها: «يا عائشة، هلمي المدية»، ثم قال: «اشحذيها بحجر»، ففعلت: ثم أخذها، وأخذ الكبش فأضجعه، ثم ذبحه، ثم قال: «باسم الله، اللَّهُمَّ تقبل من محمد، وآل محمد، ومن أمة محمد، ثم ضحى به»

আয়িশা رضي الله عنها থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ (কুরবানী করার জন্য) শিংওয়ালা একটি দুম্বা আনতে নির্দেশ দেন, যেটি কালোর মধ্যে চলে অর্থাৎ পায়ের গোড়া কালো ছিল, কালোর মধ্যে শয়ন করে অর্থাৎ পেটের নিচের অংশও কালো এবং কালোর মধ্যে দিয়েই দেখে অর্থাৎ চোখের চারদিকে কালো। সেটি আনা হলে তিনি আয়িশা رضي الله عنها বললেন: ছোরাটি নিয়ে এসো। অতঃপর বললেন, ওটা পাথরে ধার দাও। তিনি তা ধার দিলেন, পরে তিনি ছোরাটি নিলেন এবং দুম্বাটি ধরে শোয়ালেন। এরপর সেটা যবেহ করলেন। যবেহ করার প্রাক্কালে তিনি বললেন: আল্লাহর নামে। হে আল্লাহ তুমি মুহাম্মদ, তাঁর পরিবার ও তাঁর উম্মতের পক্ষ থেকে এটা কবূল করে নাও। তারপর এটা কুরবানী করলেন।[২৮]

উটে দশজন এবং গরুতে সাতজন অর্থাৎ দশ পরিবারের পক্ষ হতে একটি উট সাত পরিবারের পক্ষ থেকে একটি গরু কুরবানী করা যথেষ্ট। দলীল

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَحَضَرَ الْأَضْحَى فَاشْتَرَكْنَا فِي الْبَقَرَةِ سَبْعَةٌ وَفِي الْبَعِيرِ عَشَرَةٌ.

ইবনু আব্বাস رضي الله عنهما থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: এক ভ্রমণে আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ছিলাম। এরকম পরিস্থিতিতে কুরবানীর ঈদ উপস্থিত হলো। তখন আমরা একটি গরুতে সাতজন অংশীদার হয়ে এবং একটি উটে দশজন অংশীদার হয়ে কুরবানী আদায় করলাম।[২৯] হাদীসটি হাসান।

উটে দশজন অংশীদার হওয়ার বিষয়টি আরেকটি হাদীস দ্বারা সমর্থিত।

[২৭] *সহীহ মুসলিম হা: ১৯৬৩*

[২৮] *সহীহ মুসলিম হা: ১৯৬৭*

[২৯] *তিরমিযী হা: ১৫০১, ইবনু মাজাহ হা: ৩১৩১*

وَعَن رافعِ بن خديجٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْعَلُ فِي قَسْمِ الْمَغَانِمِ عَشْرًا مِنَ الشَّاءِ بِبَعِيرٍ.

রাফে ইবনু খাদীজ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: গানীমাত বন্টনের ক্ষেত্রে নবী ﷺ একটি উটের বিপরীতে দশটি ছাগল প্রদান করতেন।[৩০]

তিনি মোটাতাজা মাংসল দুটি দুম্বা ক্রয় করতেন। হাদীসের এ অংশ থেকে জানা যায় যে, কুরবানীর পশু সুস্থ সবল হওয়া আবশ্যক। পশুতে ত্রুটি থাকলে তা দ্বারা করা বৈধ হবে না।

(১) কানা, যে পশু অন্ধ বা কানা অর্থাৎ যে পশুর উভয় চোখ নষ্ট অথবা এক চোখ পুরোপুরি নষ্ট আর এক চোখ ভাল আছে এমন পশু দ্বারা কুরবানী বৈধ নয়।

(২) অসুস্থ্য: রুগ্ন পশু যার রোগ সুস্পষ্ট এমন পশু দ্বারা কুরবানী বৈধ নয়।

(৩) খোঁড়া; যে পশু খুঁড়িয়ে চলে অথবা তার এক পা কাটা বা ভাঙা এমন পশু দ্বারা কুরবানী করা বৈধ নয়।

(৪) শীর্ণকায়, হালকা পাতলা দুর্বল পশু দ্বারা কুরবানী বৈধ নয়। দলীল:-

عن الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ: رضى الله عنه أن النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " أَرْبَعٌ لَا تُجْزِئُ فِي الْأَضَاحِيِّ: الْعَوْرَاءُ، الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ، الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ، الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا، وَالْكَسِيرَةُ، الَّتِي لَا تُنْقِي

বারা ইবনু আযিব রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নাবী ﷺ বলেছেন: চার প্রকারের প্রাণী কুরবানীর জন্য যথেষ্ট নয়। (১) কানা যার অন্ধত্ব সুস্পষ্ট। (২) রুগ্ন যার রোগ সুস্পষ্ট, (৩) খোঁড়া পশু যার পঙ্গুত্ব সুস্পষ্ট, (৪) শীর্ণকায় হালকা পাতলা দুর্বল পশু যার হাড়ের মজ্জা শুকিয়ে গেছে।[৩১]

أَقْرَنَيْنِ، مَوْجُوءَيْنِ শিং ওয়ালা দুটি খাসী, কুরবানীর পশুর শিং থাকা ভাল। যে পশুর শিং গজায়নি, তা যদি দাঁতিল হয় তাহলে তা দ্বারা কুরবানী করতে কোনো সমস্যা নেই। তবে যদি পশুর শিং আংশিক অথবা পুরাটাই ভেঙে যায় তাহলে ঐ পশু কুরবানী করা মাকরূহ। অনুরূপভাবে পশুর কান যদি আংশিক অথবা পুরাটাই কাটা থাকে তবে তা দ্বারা কুরবানী করার ক্ষেত্রে দুটি মতামত পরিলক্ষিত হয়। অধিকাংশ আলিমের মতে তা কুরবানীর জন্য যথেষ্ট নয়। কিন্তু কিছু আলিমদের মতে তা অপছন্দনীয়। তবে তা যথেষ্ট নহে এমনটি নয়। কেননা নাবী ﷺ যথেষ্ট নয় এমন ত্রুটি চারের মধ্যে সীমাবদ্ধ করেছেন যা বারা ইবনু আযিব বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। কানের আংশিক অথবা পুরাটা না থাকা ঐ চার ত্রুটির অন্তর্ভুক্ত নয়। অতএব কান কাটা পশু দ্বারা কুরবানী করা বৈধ। তা থেকে মুক্ত হওয়া ভালো, কেননা আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন:

أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن.

রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের আদেশ করেছেন আমরা যেন কুরবানীর পশুর চোখ ও কান ভালো ভাবে দেখে নেই।[৩২]

তবে হাদীসটি দুর্বল। موجوئين দুটি খাসী, হাদীসের এ অংশ প্রমাণ করে যে, বলদ বা খাসী দ্বারা কুরবানী করতে সমস্যা নেই। বরং ছাগলের পাঁঠার চাইতে খাসী দ্বারা কুরবানী করা শ্রেয়। কেননা তার গোশত খেতে সুস্বাদু এবং পাঁঠার চাইতে খাসী বেশি মোটা-তাজা হয়। এ জন্যই নাবী ﷺ দুম্বার খাসী চয়ন করেছেন।

فيذبح أحدها عن أمته একটি পশু তাঁর উম্মাতের পক্ষ থেকে যবেহ করেন। হাদীসের এ অংশ প্রমাণ করে যে, অন্যের পক্ষ থেকে কুরবানী করা বৈধ। তবে মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে কুরবানী করা যাবে কিনা এ ব্যাপারে মতানৈক্য আছে। জীবিত ব্যক্তির সাথে যদি মৃত ব্যক্তিকে কুরবানীতে শামিল করা হয় তাহলে কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু যদি মৃত ব্যক্তির জন্য পৃথক কুরবানী করা হয় অথবা সাত ভাগের মধ্যে কতক ভাগ মৃত ব্যক্তির জন্য নির্দিষ্ট করা হয় তবে তা সাদাকাহ হিসেবে গণ্য হবে। বিধায় তা

[৩০] সহীহ বুখারী হা: ২৪৮৮
[৩১] ইবনু মাজাহ হা: ৩১৪৪, নাসায়ী- ৭/২১৫, মুসনাদ আহমাদ ৪/২৮৪
[৩২] তিরমিযী হা: ১৪৯৮, ইবনু মাজাহ হা: ৩১৪২

দরিদ্রদের মাঝে বণ্টন করে দিতে হবে। কুরবানীদাতা তা ভক্ষণ করতে পারবে না।

وذبح الأخر عن محمد وأل محمد صلى الله عليه وسلم

অন্য আরেকটি মুহাম্মাদ ﷺ-এবং তাঁর পরিবারের পক্ষ থেকে যবেহ করলেন। হাদীসের এ অংশ প্রমাণ করে যে, একটি ছাগল বা ভেড়া পরিবারের সকল সদস্যদের পক্ষ থেকে যথেষ্ট। পরিবারের সদস্য সংখ্যা যতই হোক না কেন।

কুরবানীর পশু যবেহ করার সময়:

সকল আলিম এ বিষয়ে একমত যে, ১০ই যিলহজ্জের ফজরের ওয়াক্ত হওয়ার আগে কুরবানী করা বৈধ নয়। কুরবানীর যবেহ করতে হবে ঈদের সালাতের পরে। কুরবানীদাতা স্বয়ং যদি ঈদের সালাত আদায় নাও করে থাকে তথাপি কুরবানী করা বৈধ হবে যদি অত্র অঞ্চলে ঈদের সালাত অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। দলীল:

عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه، وأصاب سنة المسلمين»

আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নাবী ﷺ বলেছেন: যে ব্যক্তি ঈদের সালাতের পূর্বেই কুরবানীর পশু যবেহ করলো সে তো নিজের জন্যই যবেহ করল। আর যে ব্যক্তি ঈদের সালাতের পর যবেহ করল তাহলে তার কুরবানী পূর্ণ হল এবং মুসলিমদের রীতি অনুযায়ী কাজ করল।[৩৩]

عن البراء بن عازب، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن أول ما نبدأ في يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن نحر قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله، ليس من النسك في شيء»

বারা ইবনু আযিব ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী ﷺ বললেন: আজকের দিনে আমরা সর্বপ্রথম সালাত আদায়ের মাধ্যমে কাজ শুরু করব। সালাত হতে ফিরে গিয়ে আমরা কুরবানী করব। যে ব্যক্তি এরূপ করবে সে ব্যক্তি আমাদের রীতি অনুসারেই কাজ করল। কিন্তু যে ব্যক্তি সালাতের আগেই কুরবানী করল তা কেবল গোশত বলেই গণ্য হবে তা সে পরিবার-পরিজনদের জন্যই করেছে। তাতে কুরবানীর কিছুই নেই।[৩৪] অত্র হাদীস দুটি প্রমাণ করে যে, সালাত আদায়ের পরেই কুরবানীর সময় শুরু হয়। তাই সলাতের পূর্বে কুরবানী করা বৈধ নয়। কেউ ঈদের সালাতের পূর্বে কুরবানীর পশু যবেহ করলে তা কুরবানী বলে গণ্য হবে না। তা সাধারণ গোশত বলে পরিগণিত হবে।

কুরবানী করার সর্বশেষ সময়:

যিলহজ্জ মাসের ১০ তারিখে ঈদের সালাত আদায়ের পরে যে কোনো সময় কুরবানী করাই উত্তম, তবে প্রয়োজনে যিলহজ্জ মাসের ১৩ তারিখের আসর সালাত পর্যন্ত কুরবানী করা বৈধ। এ বিষয়ে উম্মাতের ইজমা তথা ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত আছে।

কুরবানীর পশু হারিয়ে গেলে করণীয়:

কুরবানী ক্রয় করার পর তা হারিয়ে গেলে, চুরি হয়ে গেলে অথবা মারা গেলে তাকে কিছুই করতে হবে না। তবে তা যদি মানতের হয়ে থাকে তবে উহার পরিবর্তে আরেকটি পশু কুরবানী করতে হবে। দলীল:-

عَنْ تَمِيمِ بْنِ حُوَيَصٍ يَعْنِي الْمِصْرِيَّ، قَالَ: اشْتَرَيْتُ شَاةً بِمِنًى أُضْحِيَّةً فَضَلَّتْ , فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: لَا يَضُرُّكَ.

তামীম ইবনু হুরাইস থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: মিনাতে আমি কুরবানীর জন্য একটি ছাগল ক্রয় করার পর তা হারিয়ে গেলে এ বিষয়ে আমি ইবনু আব্বাস ﷺ-কে জিজ্ঞেস করায় তিনি বললেন: তোমার কোনো ক্ষতি নেই।[৩৫]

[৩৩] *সহীহ বুখারী হা: ৫৫৪৬, সহীহ মুসলিম হা: ১৯৬২*

[৩৪] *সহীহ বুখারী হা: ৯৬৫৪*

[৩৫] *বায়হাকী-৯/২৮৯*

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: مَنْ أَهْدَى بَدَنَةً ثُمَّ ضَلَّتْ أَوْ مَاتَتْ , فَإِنَّهَا إِنْ كَانَتْ نَذْرًا أَبْدَلَهَا , وَإِنْ كَانَتْ تَطَوُّعًا , فَإِنْ شَاءَ أَبْدَلَهَا وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهَا.

ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: যে ব্যক্তি একটি উট হাদী হিসেবে প্রেরণ করার পর তা হারিয়ে গেল অথবা মারা গেল, যদি তা মানতের হয় তবে উহার পরিবর্তে আরেকটি হাদী (কুরবানী) দিবে। আর যদি তা না হয় তাহলে ইচ্ছা করলে তার পরিবর্তে কুরবানী দিতেও পারে নাও দিতে পারে।[৩৬]

কুরবানীর ফযীলত: কুরবানীর মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জিত হয়। দলীল:

عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح، فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية، فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة، فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة، فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة، فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر

আবূ হুরাইরাহ (রাযি.) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি জুমু'আহর দিন জানাবাত গোসলের ন্যায় গোসল করে এবং সালাতের জন্য আগমন করে সে যেন একটি উট কুরবানী করল। যে ব্যক্তি দ্বিতীয় পর্যায়ে আগমন করে সে যেন একটি গাভী কুরবানী করল। তৃতীয় পর্যায়ে যে আগমন করে সে যেন একটি শিংবিশিষ্ট দুম্বা কুরবানী করল। যে চতুর্থ পর্যায়ে আগমন করল সে যেন একটি মুরগী কুরবানী করল। পঞ্চম পর্যায়ে যে আগমন করল সে যেন একটি ডিম কুরবানী করল। পরে ইমাম যখন খুৎবা দেয়ার জন্য বের হন তখন মালাইকাহ যিকর শ্রবণের জন্য উপস্থিত হয়ে থাকে।[৩৭]

অত্র হাদীস প্রমাণ করে যে, কুরবানীর ফযীলত জুমু'আর সালাতের চেয়েও বেশি।

কুরবানীর গোশত তিন ভাগ করে এক ভাগ নিজে খাবে এক ভাগ আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীকে উপঢৌকন দিবে। আর এক ভাগ গরীবদেরকে সাদাকাহ করবে। এটাই মোস্তাহাব। বাধ্যতামূলক নয়, তবে অবশ্যই তা থেকে সাদাকাহ করবে।

হাদীসের শিক্ষা:

(১) কুরবানী করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ।

(২) কুরবানীর পশু মোটাতাজা হতে হবে।

(৩) কানা, রুগ্ন, খোঁড়া ও দর্বল পশু দ্বারা কুরবানী হবে না।

(৪) কুরবানীর পশু ঈদের সালাতের পর যবেহ করতে হবে।

(৫) অন্যের পক্ষ থেকে কুরবানী করা বৈধ।

(৬) মৃত ব্যক্তির পক্ষ হতে কুরবানী করলে তা দরিদ্রদের মাঝে বণ্টন করে দিতে হবে।

(৭) কুরবানীর গোশত থেকে নিজে খাবে, প্রতিবেশী ও আত্মীয়কে হাদীয়া দিবে। কিছু অংশ অবশ্যই দান সাদাকাহ করবে।

(৮) ১০ই যিলহজ্জ তারিখে কুরবানী করা উত্তম।

(৯) যিলহাজ্জ মাসের ১৩ তারিখের আসর পর্যন্ত কুরবানী করা বৈধ।

(১০) কুরবানীদাতা যিলহজ্জ মাসের চাঁদ ওঠার পর হতে কুরবানী করা পর্যন্ত চুল, নখ কাটবে না, ছাঁটবে না। ▣▣

[৩৬] *মুয়াত্তা মালেক হা: ৮৬৬, বায়হাকী হা: ৯/২৮৯*

[৩৭] *সহীহ বুখারী হা: ৮৮১*

সম্পাদকীয় الافتتاحية

যিলহজ্জ মাসের প্রথম ১০ দিন, আরাফা দিবস, হজ্জ ও ঈদুল আযহা : বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলের বানভাসী মানুষের কষ্ট; আমাদের করণীয়

জুলাই মাসে এক সাথে অনেকগুলো বিষয় আমাদের সামনে এসেছে। প্রথমতঃ হিজরী সনের সর্বশেষ মাস যিলহজ্জ। চারটি মর্যাদাপূর্ণ হারাম মাসের একটি যিলহজ্জ। আরবিতে এ মাসের উচ্চারণ 'যুলহিজ্জাহ'। এ মাসের প্রথম ১০ দিনের রয়েছে বিশেষ মর্যাদা। মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এ মাসের প্রথম ১০ দিনের জোড় এবং বেজোড়ের কসমও করেছেন। আল্লাহর নিকট এ মাসের প্রথম ১০ দিনের ইবাদতের রয়েছে উচ্চ মর্যাদা। এ সময়ের ইবাদত আল্লাহর নিকট অতীব প্রিয় এবং পছন্দের। এমনকি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের চেয়েও। তবে যিনি জিহাদে গমন করেন তার জান ও মাল নিয়ে, অতঃপর জিহাদে শহীদ হয়ে আর ফিরে না আসেন, তার কথা ভিন্ন। এ সময়ে দিনের বেলা সিয়াম পালন, রাতে তাহাজ্জুদ সালাত আদায়, সর্বদা তাকবীর, তাহলীল, তাহমীদ ও তাসবীহে নিজেকে নিয়োজিত রাখা মুমিনের দায়িত্ব। যিলহজ্জ হজ্জের মাস। আরাফার ময়দানে সমবেত হাজীগণ হৃদয়-মন উজাড় করে আল্লাহর নিকট গুনাহ মাফের জন্য কাঁদবেন, চাইবেন জান্নাত ও দুনিয়ার জীবনে শান্তি ও পরকালে নাজাত। আরাফা দিবসে আল্লাহ সর্বাধিক গুনাহগারকে ক্ষমা করেন। দিবসসমূহের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দিবস ইয়াওমে আরাফা, তথা আরাফায় সমবেত হওয়ার দিন। সমগ্র বিশ্ব মুসলিমের জন্য আরাফা দিবসের সিয়াম পালন আগে-পিছের এক বছর করে গুনাহ মাফের কারণ। উল্লেখ্য সউদীতে যখন আরাফা দিবস, বিশ্বব্যাপী একটিই আরাফা দিবস। তাই যখন সউদীতে আরাফার মাঠে হাজীগণ গমন করবেন, সে সময়েই আমাদেরকে আরাফা দিবসের সিয়াম পালন করতে হবে, তারিখ বিবেচনায় নয়। এবার ১০ লক্ষাধিক হাজী হজ্জ আদায়ের অনুমতি পেয়েছেন।' লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইক' ধ্বনিতে এখন মক্কা মুকাররমা মুখরিত। ১০ তারিখ ইয়াওমুন নাহর। আমাদের দেশে চাঁদ উদয়ের হিসাবে হবে ঈদুল আযহা। ঈদুল আযহার প্রধান করণীয় কুরবানি। মহান রবের প্রতি নবী ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-এর আনুগত্যের চূড়ান্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণের উজ্জল নিদর্শন এ কুরবানি। যার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা সহজতর। সেজন্য কুরবানির দিন কুরবানি করা ছাড়া দ্বিতীয় কোনো উত্তম ইবাদত নেই। সামর্থ্যবান ব্যক্তিদের এ সুন্নাহ আদায়ে মহানবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকিদ দিয়েছেন। ঈদুল আযহা ও তৎপরবর্তী তিন দিন আইয়ামে তাশরিকে কুরবানি ও মেহমানদারী করা ও তাকবীর বলা ইসলামের সৌন্দর্য ও উত্তম ইবাদত। এবার যখন আমরা ঈদুল আযহা উদযাপন করব, তখন হয়ত সিলেটের বহু অংশে বানভাসি মানুষের আনন্দ-উৎসবে ঈদ পালন সম্ভব হবে না। সর্বস্ব হারিয়ে বহুজনের ঘরবাড়ী ফসলসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। এ বিপর্যস্ত সময়ে তাদের পাশে দাঁড়ানো আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। বন্যার ভয়াবহতা আমরা যা প্রত্যক্ষ করেছি তা খুবই মর্মান্তিক কষ্টকর ও বেদনাদায়ক। বিশেষতঃ হাওরাঞ্চলে বসবাসকারী গরীব অসহায় অভাবী মানুষগুলো ঘরবাড়ি হারিয়ে প্রচণ্ড খাদ্যাভাবে পড়েছে। বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস ও জমঈয়তে শুব্বানে আহলে হাদীস বন্যায় বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হতদরিদ্র মানুষের এলাকায় দ্রুত ত্রাণ সহায়তা ও খাদ্য সামগ্রী পৌঁছানের কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। মাননীয় জমঈয়ত সভাপতি নিজে সিলেট গিয়ে ত্রাণ দিয়ে এসেছেন। আমরা তাঁর এ উদ্যোগকে স্বাগত জানাই। আমরা জানি, ইসলাম মানবতার ধর্ম, মানব সেবার ধর্ম। তাই সামর্থ্য অনুযায়ী আমরা সবাই বন্যাকবলিত মানুষের পাশে দাঁড়াই। এ সময়ে এটিই সর্বোত্তম খিদমতে খালক। বিভিন্ন ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহ যিলহজ্জ মাসের পূণ্য অর্জনে আমাদেরকে তাওফীক দান করুন। আমীন।

ইমাম সিদ্দীক হাসান খাঁন ভূপালী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) এবং তাওহীদ ও আকীদাহ

ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী❖

(পর্ব-৪)

তাওহীদ বর্ণনায় ইমাম সিদ্দীক হাসান খাঁন ভূপালী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)

তাওহীদের পরিচয়

তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাতের পরিচয় :

ইমাম সিদ্দীক হাসান খাঁন ভূপালী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাতের পরিচয়ে বলেন–

هو إثبات حقيقة الرب تعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه وتكلمه بكتبه وتكليمه لمن شاء من عباده، وإثبات عموم قضائه وقدره وحكمته.

"তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাত হচ্ছে, রবের হাকীকত, তাঁর গুণাবলি, তাঁর কর্মকাণ্ড ও নামসমূহকে এবং তাঁর কিতাবসমূহের মাধ্যমে তাঁর কথা বলা, তাঁর ইচ্ছানুযায়ী যে-কোনো বান্দার সাথে কথা বলাকে সাব্যস্ত করা। এছাড়া তাঁর সার্বজনীন ফায়সালা, নির্ধারণ ও হিকমতকে সাব্যস্ত করা।"[৩৮]

তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাতের ক্ষেত্রে ইমাম সিদ্দীক হাসান খাঁন ভূপালী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-এর গৃহীত মূলনীতিঃ

১. কুরআন ও সুন্নায় বর্ণিত আল্লাহর যাবতীয় নাম ও গুণকে সাব্যস্ত করা :

ইমাম সিদ্দীক হাসান খাঁন ভূপালী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-এর মতে কুরআন ও সুন্নায় আল্লাহর যেসব নাম ও গুণ বর্ণিত হয়েছে, তা সাব্যস্ত করতে হবে। তিনি বলেন,

والأصل في هذا الباب أن كل ما ثبت في كتاب الله أو سنة رسوله وجب التصديق به

"আসমা ওয়াস সিফাতের ক্ষেত্রে মূলনীতি হলো, আল্লাহর কিতাব ও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নায় যাকিছু প্রমাণিত, তা সত্য বলে বিশ্বাস করা ওয়াজিব।"[৩৯]

তিনি আরো বলেন,

وكل ما وصف به الرسول ربه من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان به فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون به.

"আহলুল ইলমগণ যেসব হাদীস গ্রহণ করেছেন, সে-সব গ্রহণযোগ্য সহীহ হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহর যেসব গুণের কথা বলেছেন, তার প্রতি ঈমান রাখা ওয়াজিব। মুক্তিপ্রাপ্ত দল আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আহ তার প্রতি ঈমান রাখে।"[৪০] তিনি অন্যত্র বলেন,

ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف الله به نفسه المقدسة في كتابه العزيز وبما وصفه به رسوله محمد.

"আল্লাহর প্রতি ঈমানের অংশ হচ্ছে, মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তাঁর কিতাবে এবং তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ যে-সব গুণ দ্বারা আল্লাহকে গুণান্বিত করেছেন, সেসব গুণের প্রতি ঈমান রাখা।"[৪১] তিনি আরো বলেন,

متى ثبت النقل بشيء من أوصافه وأسمائه قبلناه واعتقدناه وسكتنا عما عداه كما هو طريق السلف

"আল্লাহর কোনো নাম ও গুণ কুরআন ও সুন্নায় পাওয়া গেলে তখন তা আমরা গ্রহণ করব এবং তার ওপর বিশ্বাস রাখব। তা ব্যতীত সব থেকে চুপ থাকব, যেমনটি সালাফদের তরীকা।"[৪২]

২. সালাফদের তরীকা অনুসরণ :

তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাতের ক্ষেত্রে জাহমিয়া, মুতাযিলা, মুশাব্বিহাহ ইত্যাদি ফিরকার বিভ্রান্তির মূল কারণ সালাফদের তরীকা বর্জন করে স্ব-আবিষ্কৃত তরীকার অনুসরণ করা। ইমাম সিদ্দীক হাসান খাঁন ভূপালী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) স্বীয় মানহাজের বর্ণনায় বলেন যে, তিনি

❖ *সেক্রেটারী জেনারেল- বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস।*

[৩৮] *প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪১*

[৩৯] *কাতফুস সামার ফী আকীদাতি আহলিল আসার, পৃ. ৮২*

[৪০] *প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৬*

[৪১] *প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪*

[৪২] *আদ-দ্বীনুল খালিস, খ. ১, পৃ. ৯৮*

তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাতের ক্ষেত্রে সালাফদের তরীকার অনুসারী। কেননা তাদের তরীকা নিরাপদ ও ভ্রান্তিমুক্ত। তিনি বলেন,

فنتبع في ذلك سبيل السلف الماضين الذي هم أعلم الأئمة بهذا الشأن نفيا واثباتا وهم أشد تعظيما لله وتنزيها له عما لا يليق بحاله.

"আল্লাহর নাম ও গুণাবলি সাব্যস্তকরণ ও নাকচকরণের ক্ষেত্রে আমরা পূর্ববর্তী সালাফদের তরীকার অনুসরণ করব। তারা ছিলেন এ ব্যাপারে সর্বাধিক জ্ঞানী। আল্লাহকে শ্রেষ্ঠত্বদান এবং তাঁর শানের খেলাফ-বিষয় থেকে তাঁকে পবিত্রকরণের ব্যাপারে তারা সর্বাধিক গুরুত্ব দিতেন।"[৪৩]

৩. আল্লাহ যাবতীয় পূর্ণাঙ্গ সিফাতের অধিকারী এবং সকল প্রকার দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত :

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের আকীদাহ হচ্ছে, আল্লাহ যাবতীয় পূর্ণাঙ্গ সিফাতের অধিকারী এবং সকল প্রকার দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত। এ প্রসঙ্গে ইমাম সিদ্দীক হাসান খাঁন ভূপালী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন,

المتصف بصفات الكمال ونعوت الجلال والجمال، المنزه عما يقوله الظالمون والمعطلون والمتكلمون... وهو ذو الكبرياء الذي يصغر كل شيء سواه، وهو عبارة عن كمال ذاته وعظيم قدرته وسلطانه وتفرده بالإلهية.

"আল্লাহ পূর্ণাঙ্গ সিফাত এবং মর্যাদাপূর্ণ ও উত্তম বিশেষণে বিশেষিত। জালিম, মুআত্তিলা ও কালামপন্থিরা যা বলে তা থেকে তিনি পবিত্র ও মুক্ত।... বড়ত্বের অধিকারী। তিনি ছাড়া সবকিছু ক্ষুদ্র। তিনি পূর্ণাঙ্গ সত্তা এবং মহা ক্ষমতা ও রাজত্বের মালিক। তিনি একক ইলাহ।"[৪৪] তিনি আরো বলেন,

وأما توحيد الرسل فهو إثبات صفات الكمال له وإثبات كونه فاعلا بمشيئته وقدرته واختياره.

"রাসূলগণের তাওহীদ হলো, তাঁর পূর্ণাঙ্গ সিফাতকে সাব্যস্ত করা। আরো সাব্যস্ত করা যে, তিনি নিজ ইচ্ছায়, ক্ষমতায় ও পছন্দে কর্মসম্পাদনকারী।"[৪৫]

তিনি অন্যত্র বলেন,

بل هو سبحانه موصوف بصفات الكمال، منزه عن كل نقص وعيب، وهو سبحانه في صفات الكمال لا يماثله شيء.

"আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা পূর্ণাঙ্গ সিফাতে বিশেষিত। যাবতীয় ত্রুটি ও দোষ থেকে পবিত্র। তাঁর পূর্ণাঙ্গ সিফাতের কোনো সাদৃশ্য নেই।"[৪৬]

৪. আল্লাহর প্রমাণিত কোনো নাম ও গুণ অস্বীকার করা যাবে না :

ইমাম সিদ্দীক হাসান খাঁন ভূপালী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, আল্লাহর যে নাম ও গুণ ওহী দ্বারা প্রমাণিত, তা কোনোভাবে অস্বীকার করা যাবে না। তিনি আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের নীতির কথা এভাবে ব্যক্ত করেন,

ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه ولا يلحدون في أسمائه وآياته.

"যেসব সিফাত দ্বারা আল্লাহ নিজেকে গুণান্বিত করেছেন, তারা তা অস্বীকার করে না, তাহরীফ করে না। তাঁর নামসমূহ ও নিদর্শনসমূহে ইলহাদ করে না।"[৪৭] তিনি বলেন,

ولا نجحد صفات خالقنا من علوه على خلقه، واستوائه على عرشه.

"আমরা আমাদের স্রষ্টার সিফাতকে অস্বীকার করব না, যেমন–তাঁর সৃষ্টির ঊর্ধ্বে হওয়া এবং তাঁর আরশের ওপর সমুন্নত হওয়া।"[৪৮]

তিনি বিভ্রান্ত দার্শনিকদের তাওহীদের ব্যাপারে বলেন, "তাদের তাওহীদ হচ্ছে আল্লাহর সিফাতকে অস্বীকার করা।" তিনি বলেন,

---

[৪৩] *কাতফুস সামার ফী আকীদাতি আহলিল আসার, পৃ. ৯১*
[৪৪] *আদ-দ্বীনুল খালিস, খ. ১, পৃ. ২৭*
[৪৫] *প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৭১*
[৪৬] *কাতফুস সামার ফী আকীদাতি আহলিল আসার, পৃ. ৮৯*
[৪৭] *প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬*
[৪৮] *আদ-দ্বীনুল খালিস, খ. ১, পৃ. ৭৪*

أما توحيد الفلاسفة إنكار صفات كماله.

"দার্শনিকদের তাওহীদ হচ্ছে আল্লাহর কামালিয়াতের সিফাতকে অস্বীকার করা।"[৪৯]

ইমাম সিদ্দীক হাসান খাঁন ভূপালী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-এর মতে, সিফাতকে অস্বীকার করা আল্লাহর ওপর মিথ্যারোপ করা। সিফাতকে অস্বীকার করা বিভ্রান্তি ও ভ্রষ্টতা। এটি বিপদগামী জাহমিয়া ও মুতাযিলাদের তরীকা। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন,

فهذا مفتر على الله فيما نفاه عنه ، وهذا أصل ضلال الجهمية من المعتزلة ، ومن وافقهم على مذهبهم ، فإنهم يظهرون للناس التنزه ، وحقيقة كلامهم التعطيل ، فيقولون ، نحن لا نجسم ، بل نقول : إن الله ليس بجسم ، ومرادهم بذلك نفي حقيقة أسمائه وصفاته ، فيقولون : ليس لله علم ولا قدرة ، ولا حياة ولا كلام ، ولا سمع ولا بصر ، ولا يرى في الآخرة ، ولا عرج النبي صلى الله عليه وسلم إليه ، ولا ينزل منه شيء ، ولا يصعد إليه شيء ، ولا يتجلى لشيء ولا يقرب منه شيء إلى غير ذلك... فالمعطل يعبد عدمًا ، والممثل يعبد صنمًا ، والمعطل أعمى ، والممثل أعشى.

আল্লাহর কোনো সিফাতকে নাকচ করা তাঁর ওপর মিথ্যাচার করার শামিল। এটা মুতাযিলাদের অন্তর্গত জাহমিয়াদের বিভ্রান্তির মূল। যারা তাদের নীতির সাথে একমত, তারা মানুষের সামনে প্রকাশ করে যে, তারা আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছে। অথচ তা মূলত আল্লাহর সিফাতকে তা'তীল বা অস্বীকার করা। তারা বলে, আমরা আল্লাহর দেহ সাব্যস্ত করি না। আমরা বলি, আল্লাহ দেহবিশিষ্ট নন-এ কথার মাধ্যমে আল্লাহর নাম ও গুণাবলির হাকীকতকে অস্বীকার করা তাদের উদ্দেশ্য। তারা বলে, আল্লাহর ইলম নেই, ক্ষমতা নেই, হায়াত নেই, কালাম নেই, শ্রবণ নেই, দর্শন নেই, তাঁকে কিয়ামতের দিন দেখা যাবে না, তাঁর কাছে নবী ﷺ এর মিরাজ হয়নি, তিনি অবতরণ করেন না, উঠেন না, কারো জন্য প্রকাশ হবেন না, কারো নিকটবর্তী হন না ইত্যাদি। সিফাতকে অস্বীকারকারীরা অনস্তিত্বের ইবাদত করে আর দৃষ্টান্তদানকারীরা মূর্তির ইবাদত করে। অস্বীকারকারীরা অন্ধ আর দৃষ্টান্তকারীরা রাতকানা।[৫০]

এমনকি ইমাম সিদ্দীক হাসান খাঁন ভূপালী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) মতে আল্লাহর সিফাতকে অস্বীকারকারীরা কাফির। তিনি বলেন,

ومن جحد شيئًا مما وصف الله به نفسه فهو كافر.

"যে-ব্যক্তি আল্লাহ নিজের জন্য যে সিফাতের বর্ণনা দিয়েছেন, তার কোনো কিছু অস্বীকার করে, সে কাফির।"[৫১]

৫. তাঁর গুণের কোনো সাদৃশ্য নেই :

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের আকীদাহ হচ্ছে, আল্লাহর নাম ও গুণের কোনো সাদৃশ্য নেই। তাঁর সত্তায় যেমন কোনো মাখলূক সাদৃশ্য রাখে না, অনুরূপ তাঁর নাম ও গুণে কোনো মাখলূখ সাদৃশ্য রাখে না। ইমাম সিদ্দীক হাসান খাঁন ভূপালী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন,

وواحد في ذاته لا قسيم له. وواحد في صفاته، لا يشبهه شيء من خلقه.

"তিনি তাঁর সত্তায় একক। তাঁর সত্তায় কোনো বিভাজ্য নেই। তিনি তাঁর সিফাতে একক। মাখলূকের কোনো কিছু তাঁর সাদৃশ্য রাখে না।"[৫২] তিনি অন্যত্র বলেন,

وكما أن ذاته ليست كالذوات المخلوقة ، فصفاته ليست كالصفات المخلوقة ،

"যেমন তাঁর সত্তা মাখলূকের সত্তার মতো নয়, অনুরূপ তাঁর সিফাত মাখলূকের সিফাতের মতো নয়।"[৫৩]

তাঁর মতে সাদৃশ্যপ্রদান ভ্রষ্টতা ও গোমরাহি। তিনি বলেন,

ومن مثل الله بخلقه فهو ضال.

"যে ব্যক্তি আল্লাহকে তাঁর সৃষ্টির সাথে উপমা ও সাদৃশ্য দেয়, সে বিভ্রান্ত।" (চলবে ইনশা আল্লাহ)

[৪৯] *প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৬৯*

[৫০] *কাতফুস সামার ফী আকীদাতি আহলিল আসার, পৃ. ৮৯; আদ-দ্বীনুল খালিস, খ. ১, পৃ. ৬৯-৭০*

[৫১] *কাতফুস সামার ফী আকীদাতি আহলিল আসার, পৃ. ৭৯*

[৫২] *আদ-দ্বীনুল খালিস, খ. ১, পৃ. ১৪*

[৫৩] *কাতফুস সামার ফী আকীদাতি আহলিল আসার, পৃ. ৮৯*

কুরআন-সুন্নাহর আলোকে চিন্তা ও বিষন্নতা

ড. আব্দুল্লাহ আল খাত্বের
অনুবাদ: মুহাম্মদ আব্দুল্লাহিল কাফী*

(২য় পর্ব)

মানুষের হৃদয়ের ছোট ছোট চিন্তা-ভাবনাগুলো ধীরে ধীরে দুশ্চিন্তার রূপ ধারণ করে। এটি দীর্ঘ হলে পরবর্তীতে তা আরো ব্যাপক হয়ে বিষন্নতায় পরিণত হয়। এটি মানুষের মানসিক অবস্থা পরিবর্তনের সাথে সাথে শারীরিক পরিবর্তনেও প্রভাব ফেলে। বাস্তবতার আলোকে মানসিক হাসপাতালে গেলে এর বহুমুখী বাহ্যিক উপসর্গগুলো চেনা যায়। যেমন দুশ্চিন্তার কারণে কান্না-কাটি, পানাহারে অনীহা ও কাজ কর্মে অমনোযোগিতা পরিলক্ষিত হয়। সে কারণে বিষন্নতার ব্যাধি কর্মক্ষম ও উদ্যমী মানুষকে আস্তে আস্তে অলস, উদাসীন ও অক্ষমতার দিকে ধাবিত করে। এমনকি বিষন্নতা হেতু মানুষকে ভুলে যাওয়া রোগে আক্রান্ত হয়। বিষন্ন মানুষ জীবনকে অর্থহীন মনে করে, নিজেকে তুচ্ছ জ্ঞান করে এবং আত্মমর্যাদা বোধ হারিয়ে ফেলে। এমনিভাবে দুনিয়াবী যিন্দেগীর প্রতি অনীহা ও বিতৃষ্ণা চলে আসার কারণে মৃত্যু কামনা করে এবং পরিশেষে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়।

বিষন্নতার ব্যাধিতে আক্রান্ত হলে মানুষের নানারূপ শারীরিক সমস্যার সৃষ্টি হয়। যেমন: নিদ্রাহীনতা, হঠাৎ ঘুম ভেঙে যাওয়া, দুঃস্বপ্ন দেখা ও শরীরের ওজন কমে যাওয়া। নারীরা এই দুশ্চিন্তার রোগে আক্রান্ত হলে তাদের নিয়মিত মাসিকের ধারাবাহিকতা ও স্বাভাবিকতা নষ্ট হয় এবং পুরুষদের যৌন চাহিদা হ্রাস পায় এবং কর্মক্ষমতা কমে যায়। এছাড়াও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ব্যক্তি মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। সে নিজেকে বড় ও মারাত্মক কোনো রোগে আক্রান্ত মনে করে। সে নিদ্রার মাঝে কখনো অদৃশ্য আওয়াজ শুনতে পায়। এতে সে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। অতঃপর সে নিজেকে ধিক্কার দেয় এবং সামান্য কারণে অনেক বড় অপরাধী মনে করে। ধীরে ধীরে কাজ-কর্মে অলস হয়ে পড়ে।

আমরা জানি যে, কোনো ব্যক্তির হৃদয়ে গুনাহ, সীমালঙ্ঘন, ও ত্রুটি-বিচ্যুতির অনুভূতি, অপরাধবোধ জাগ্রত হওয়া নিঃসন্দেহে একটি ভাল লক্ষণ। তবে এটি যদি মানুষকে উৎপাদনমুখিতা, কর্মক্ষমতা, তাওবা ও উন্নতির দিকে ধাবিত করে তবে নিশ্চয় তা উত্তম। তবে এটি যদি সাহসিকতা ও শক্তি সামর্থ্য, বীরত্ব কমিয়ে দেয়, তাকে অকর্মন্য করে, তবে তা অবশ্যই বিষন্নতার একটি সুস্পষ্ট উপসর্গ।

আমরা খবরের কাগজে মাঝে মাঝে এমন সব খবর দেখি যাতে আমরা হতচকিত হয়ে যাই। যেমন: কোনো মানুষ তার স্ত্রী-সন্তানকে হত্যা করা অথবা অতি আপনজনকে স্বাভাবিকভাবে হত্যা করা। অতঃপর নিজে আত্মহত্যায় প্রবৃত্ত হওয়া। মূলত শুধু বিষন্ন ব্যক্তিদের দ্বারাই এরূপ অপরাধ সংঘটিত হয়। কেননা, তারা অন্যের জীবন হরণকে মঙ্গলজনক মনে করে। বর্তমানকালে এমনকি যুব সমাজের মাঝেও হতাশা ও বিষন্নতার কারণে আত্মহত্যার প্রবণতা ব্যাপকভাবে বেড়ে চলেছে। বিষন্নতায় আক্রান্ত ব্যক্তিরা সাধারণত দুনিয়া বিরাগী হওয়ার ফলে এরূপ জঘন্য ও হীন কাজে প্রবৃত্ত হয়।

বিষন্নতার কারণসমূহ:

বিষন্নতার কারণসমূহ সাধারণত দুই প্রকার: (ক) বাহ্যিক ও (খ) আভ্যন্তরীন

বাহ্যিক কারণসমূহের আন্তর্গত বিষয়গুলো হচ্ছে- পরিবেশগত সমস্যা - যেমন: দুনিয়াবী কোন দুর্ঘটনা - এসবের মধ্যে রয়েছে কেউ দুনিয়াতে তার প্রিয় কোনো ব্যক্তির তিরোধান বা মৃত্যু। অতি আপনজনের সাথে আকস্মিক সম্পর্কচ্ছেদ, দাম্পত্য জীবনে কলহ-বিবাদ ও পরিশেষে সম্পর্কের ইতি ঘটা। বিশ্বস্ত ও আপনজনদের মাধ্যমে ধোঁকা ও প্রতারণার শিকার হওয়া। পেশাগত জীবনে নিজের একনিষ্ঠতা ও ভাল কাজের স্বীকৃতি না পাওয়া এবং মানুষের নিকট প্রাপ্য ও মর্যাদা না পাওয়া ইত্যাদি। এরূপ অবস্থার শিকার হলে কোনো ব্যক্তি খুবই বিমর্ষ হয়ে পড়ে। এসব পরিস্থিতিতে মানুষ কয়েকটি স্তর অতিবাহিত করে। প্রথমত, বিষয়টি তার নিকট অকল্পনীয় ও অবাস্তব মনে হয়। এমন তার নিকট অবিশ্বাস্য মনে হয়। দ্বিতীয়ত অনুভূতিহীন হয়ে পড়ে। মানুষের প্রিয়জনের

* শুব্বান বিষয়ক সেক্রেটারী, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস ও কর্মকর্তা, রাজকীয় সউদী দূতাবাস, ঢাকা।

তিরোধানে কখনো কখনো অনুভূতিহীন হয়ে পড়ে। এই অবস্থা সাধারণত প্রায় ২ সপ্তাহ স্থায়ী হয়।

তৃতীয় পর্যায়ে এসে সে ক্রন্দন করে /কাঁদতে থাকে ও মানসিক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। এতে ধীরে ধীরে পানাহারের চাহিদা কমতে থাকে। সর্বশেষ ও চতুর্থ পর্যায়ে এসে কখনো কখনো সে বাস্তবতা উপলব্ধি করতে থাকে এবং আল্লাহর ফয়সালা ও তাকদীরের আমোঘ বিধানের কাছে আত্মসমর্পণ করে ও স্বাভাবিক জীবন যাপনে ফিরে আসে। উপযুক্ত সকল স্তর অতিবাহিত হয় প্রায় ৬ মাসে।

বিশেষত মানুষের প্রিয়জনের তিরোধানে ১/২ বছর যাবত যখনই সে স্মৃতি রোমন্থন করে তখনই সে কান্না করে, বিমর্ষ হয়, এটি প্রচণ্ডভাবে বেশি হলে তখন সে বিষন্নতা রোগে আক্রান্ত হয় এবং ধীরে ধীরে তার কর্মজীবন হতে অব্যাহতি নিয়ে থাকে। এটি বিষন্নতার সর্বশেষ মানসিক অবস্থা।

দ্বিতীয়ত চিকিৎসার ক্ষেত্রে দীর্ঘ সময় ঔষধ সেবনের ফলে কখনো মানুষ দুশ্চিন্তা ও বিষন্নতা রোগে আক্রান্ত হয়। এটি বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে প্রমাণিত। ঔষধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার ফলে মানুষের মস্তিষ্কে নানারূপ সমস্যার উদ্ভব হয় এবং আস্তে আস্তে বিষন্নতার মানসিক ব্যাধি তাকে আক্রমণ করে।

তৃতীয়ত নেশা ও মাদক জাতীয় বস্তু সেবনের ফলে মানুষ বিষন্নতা রোগে আক্রান্ত হয় এবং কখনো দীর্ঘ সময় ধরে মাদক সেবনের পর হঠাৎ তা বন্ধ করলেও বিষন্নতায় আক্রান্ত হয়। এমনকি এরূপ ব্যক্তি আত্মহত্যায় প্রবৃত্ত হয়। সাম্প্রতিককালে মাদক জাতীয় বিভিন্ন দ্রব্যের ব্যাপক প্রসারের কারণে আগামী প্রজন্ম চরম অধঃপতনের মুখোমুখি অবস্থান করছে। উল্লেখযোগ্য একটি সময় ধারাবাহিকভাবে এসব নেশাজাতীয় দ্রব্য সেবনের ফলে তারা নানারকম মানসিক সমস্যায় পতিত হয়। এটি অবশেষে তাদেরকে বিষন্নতা রোগে আক্রান্ত করে। এসব নেশা জাতীয় দ্রব্যে কিছু নির্দিষ্ট পেশাজীবির লোকজনও আক্রান্ত। যেমন রাত্রি জেগে যারা দায়িত্ব পালন করেন। বিশেষত যারা বড় বড় কাভার্ড ভ্যান বা লরি চালান এবং বিভিন্ন কল-কারখানায় ডিউটি পালন করেন। [মূল বিষয় হচ্ছে মাদক বা সকল নেশা জাতীয় দ্রব্যই মানুষের সার্বিকভাবে ক্ষতিকর। সেজন্যই আল্লাহ তা'আলা ও রাসূল ﷺ তা মানুষের জন্য নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। কুরআন-সুন্নাহর সুস্পষ্ট দলীলের মাধ্যমে তা প্রমাণিত। তবে তা একবারে নিষিদ্ধ না করে ধারাবাহিকভাবে নিষিদ্ধেও ঘোষণা এসেছে। কেননা, তৎকালীন যুগে আরবের লোকজন মদ ও জুয়ার প্রতি খুবই আসক্ত ছিল। আল কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلۡقُواْ بِأَيۡدِيكُمۡ إِلَى ٱلتَّهۡلُكَةِ وَأَحۡسِنُوٓاْۛ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُحۡسِنِينَ﴾

অর্থাৎ "আর তোমরা আল্লাহর পথে ব্যয় করো, এবং স্বহস্তে নিজেদেরকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিওনা, আর তোমরা ইহসান করো। নিশ্চয় আল্লাহ মুহসীনদের ভালবাসেন।"[৫৪] আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

﴿يَسۡـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلۡخَمۡرِ وَٱلۡمَيۡسِرِۖ قُلۡ فِيهِمَآ إِثۡمٞ كَبِيرٞ وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثۡمُهُمَآ أَكۡبَرُ مِن نَّفۡعِهِمَاۗ﴾

"লোকেরা আপনাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলুন, দুটোর মধ্যেই রয়েছে মহাপাপ এবং মানুষের জন্য উপকারও; আর এ দুটোর পাপ উপকারের চাইতে অনেক বড়'।"[৫৫] মদ নিষিদ্ধের ঘোষণায় আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ﴾

"হে মুমনিগণ! মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ণয় করার শর তো কেবল ঘৃণার বস্তু, শয়তানের কাজ। কাজেই তোমরা সেগুলো বর্জন করো- যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।"[৫৬] উপর্যুক্ত আয়াতের তাফসীরে সহীহ মুসলিমে আবু সাঈদ আল খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত হয়েছে, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা মদ হারাম করেছেন। যার নিকট এ আয়াত পৌঁছেছে, তার নিকট যদি মদের কিছু অংশ থাকে, সে যেন তা পান না করে ও বিক্রি না করে। এছাড়াও হাদীসের প্রসিদ্ধ ও মৌলিক গ্রন্থসমূহেও মদ ও নেশা জাতীয় দ্রব্যের নিষিদ্ধতা সম্পর্কে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। সুস্থ, সুন্দর ও পবিত্র জীবনের জন্য মদ, জুয়াসহ ইসলামী শরী'আহ কর্তৃক নিষিদ্ধ সকল বিষয় হতে দূরে থাকা ও এগুলো বর্জন করা প্রত্যেক মুমিনের জন্য অপরিহার্য। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে তাঁর হুকুমসমূহ যথাযথভাবে পালন করার তাওফীক দিন। আমীন। অনুবাদক] **(চলবে ইনশা আল্লাহ)**

---

[৫৪] *সূরা আল বাকারা আয়াত: ১৯৫*
[৫৫] *সূরা আল বাকারা আয়াত: ২১৯*
[৫৬] *সূরা আল মায়িদাহ আয়াত: ৯০*

দাওয়াতে দ্বীনের পদ্ধতি ও রূপরেখা

শাইখ আব্দুল মুমিন বিন আব্দুল খালিক্ব [*]

(পর্ব-০৫)

❖ দাওয়াতে দীনের মানহাজঃ

আল্লাহ সুবহানাহূ ও তা'আলা যমীনে দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য যেমন অসংখ্য নাবী ও রাসূলকে একনিষ্ঠ দায়ী হিসাবে প্রেরণ করেছেন ঠিক তেমনি দাওয়াতে দ্বীনের উত্তম আদর্শ ও পদ্ধতি এবং রূপরেখা প্রণয়ন করেছেন।

সুতরাং আল্লাহর যমীনে আল্লাহরই দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য মানবীয় মনগড়া মতবাদ বা মতাদর্শ কোনো ক্রমেই প্রযোজ্য নয়। বরং দাওয়াতে দ্বীন তথা দ্বীনের দাওয়াতের জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কর্তৃক নির্দেশিত মানহাজই চূড়ান্ত। মানহাজ যদি বিশুদ্ধ না হয় তাহলে দ্বীনের দাওয়াত কখনই সঠিক পথে পরিচালিত হবে না এবং এতে কোনো সফলতাও আসবে না।

অতঃএব সত্য দ্বীনের দাওয়াত দেওয়ার পূর্বে সঠিক মানহাজ জানা অত্যন্ত জরুরি।

❖ মানহাজ কী?

মানহাজ হলো আরবী শব্দ (منهج) এটি নাহজুন (نهج) শব্দ হতে নির্গত, যার শাব্দিক অর্থ: الطريق الواضح - বা সুস্পষ্ট পথ বা রাস্তা, কর্মপন্থা, পদ্ধতি ইত্যাদি। যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী:

﴿لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾

আমি তোমাদের প্রত্যেকের জন্য একটি শরীয়াত ও একটি কর্মপথ নির্ধারণ করে দিয়েছি।[৫৭]

উল্লেখিত আয়াতে কারীমায় আলোচ্য (منهاج) মিনহাজ বা (منهج) মানহাজ শব্দের ব্যাখ্যায় আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেনঃ معنى المنهاج سبيلا وسنة অর্থাৎ মিনহাজ বা মানহাজ অর্থ, পথ ও পদ্ধতি। এছাড়া আল্লামা সুদ্দী, মুজাহিদ (রহিমাহুল্লাহ)সহ অন্য মুফাসসিরগণও অভিন্ন ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন।[৫৮]

আল্লামা আদনান আল আরউর (রহিমাহুল্লাহ) বলেনঃ মানহাজ (منهج) শব্দটির দুটি অর্থ হতে পারে।

১. মানহাজ শব্দের আম বা ব্যাপক ও সর্বজনীন অর্থ হলোঃ الصراط والطريق والسبيل পথ, পন্থ বা রাস্তা। যেমন বলা হয়, منهج الإسلام বা ইসলামের পথ, صراط القرآن বা কুরআনের পথ ও سبيل الرسول বা রাসূল (ﷺ)-এর দেখানো পথ। আর এ অবস্থায় ইসলামের সকল বিষয় তথা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ থেকে শুরু করে রাস্তা হতে কষ্টদায়ক বস্তু সরানো পর্যন্ত আকিদা ইবাদত, শরীয়াত ও চরিত্র এসব বিষয় মানহাজের অন্তর্ভুক্ত হবে।

২. মানহাজ (منهج) এর খাছ অর্থ দ্বারা দাওয়াতের পদ্ধতি, কোনো বিষয়ের সিদ্ধান্তে পৌঁছার পথ ও শাসক শাসিতের বিধিবিধানসহ বিভিন্ন বিষয়ের ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্য হতে পারে।[৫৯]

তবে মানহাজ (منهج) এর শারয়ী অর্থ হলোঃ

بأنه الطريقة الشرعية المتبعة لإقامة دين الإسلام فى الأرض

পৃথিবীতে দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য অনুসৃত শরয়ী পথ ও পদ্ধতি।

আলোচ্য সংজ্ঞায় উল্লেখিত শব্দ الشرعية বা শরীয়াত দ্বারা আল্লাহ তা'আলা তার কিতাবে ও নাবী (ﷺ)-এর সুন্নাহয় যা নির্ধারণ করেছেন কেবলমাত্র সেটাই উদ্দেশ্য।

সুতরাং কিতাব ও সুন্নাহর বাহিরের সমস্ত পথ ও পদ্ধতি শারয়ী মানহাজের বহির্ভূত বিষয়।

---

[*] মুদাররিস, মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া যাত্রাবাড়ী, ঢাকা ও পাঠাগার সম্পাদক- বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস, ঢাকা মহানগর।

[৫৭] সূরা মায়িদাহ আয়াত: ৪৮, মানহাজুত তাশরীঈ-৫১পৃ.

[৫৮] তাফসীর ইবনে কাসীর: ৩/১২৯ পৃ:

[৫৯] মিনহাজুল ইতিদাল পৃ: ৬৪

এছাড়াও উল্লেখিত সংজ্ঞায় আলোচিত المتبعة শব্দ দ্বারা এমন মানহাজ বা কর্মপদ্ধতি উদ্দেশ্য যা এ উম্মাতের পূর্ববর্তী তথা সাহাবীগণের অনুসৃত। অর্থাৎ, সাহাবীগণ যে কর্ম পদ্ধতির অনুসরন করেছেন।

সুতরাং মানব রচিত সকল বিদআতী কর্মপদ্ধতি মানহাজ থেকে বেরিয়ে যাবে।[৬০]

সুতরাং কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত নয় এবং সাহাবীগণ কর্তৃক অনুসৃত নয় এমন কোনো পদ্ধতি দ্বীনের দাওয়াতের জন্য বৈধ নয়। আল্লাহ সুবহানাহূ ওয়া তা'আলা দ্বীনের দাওয়াতের জন্য যে নীতিমালা প্রদান করেছেন দাওয়াত ও তাবলীগের ক্ষেত্রে উক্ত নীতিমালাই চূড়ান্ত ও সর্বাধুনিক।

❖ দাওয়াতে দ্বীনের ক্ষেত্রে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ প্রদত্ত নীতিমালা:

দ্বীনের দাওয়াতের ক্ষেত্রে আল্লাহ সুবহানাহূ ওয়া তা'আলা বলেন:

﴿ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾

হে রাসূল! আপনি আপনার প্রতিপালকের জ্ঞান-বুদ্ধি ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে মানুষদেরকে আহ্বান করুন এবং তাদের সঙ্গে উত্তম পন্থায় বিতর্ক করুন।[৬১]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

﴿قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾

বলুন এটাই আমার পথ, আমি এবং যারা আমার অনুসরণ করছে তারাও আল্লাহর পথে আহ্বান করছি স্পষ্ট জ্ঞানের মাধ্যমে। আল্লাহ মহান পবিত্র; আমি কখনও মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হব না।[৬২]

উল্লেখিত দুটি আয়াতে কারীমায় আল্লাহ তা'আলা নাবী ﷺ-কে এক আল্লাহর দিকে তথা তাওহীদের দিকে মানুষদের আহ্বান করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন এবং সে দাওয়াতটা অবশ্যই উত্তম উপদেশমালা ও প্রজ্ঞাপূর্ণ হতে হবে। কাজেই আক্রমণাত্মক ও কর্কশ ভাষা ও অজ্ঞতায় ভরপুর তথা জ্ঞানগত সীমাবদ্ধতার মধ্য থেকে দাওয়াতে দ্বীনের নেতৃত্ব প্রদান করা মোটেও বিশুদ্ধ মানহাজ নয়।

সুতরাং তাওহীদের দিকে মানুষকে দাওয়াত দিতে হলে অবশ্যই তাওহীদ ও দাওয়াতে দ্বীনের বিষয়ে অবশ্যই প্রজ্ঞা থাকতে হবে। আর তাওহীদের দিকে দাওয়াত দেওয়াই নাবী ﷺ-এর মানহাজ।

আল্লাহ তা'আলার বাণী: قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو

অর্থাৎ, একমাত্র আল্লাহর দিকে আহ্বান করাই আমার পথ বা মতাদর্শ।

সুতরাং তাওহীদবিহীন কোনো দাওয়াতই দ্বীনের দাওয়াত নয়।

আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস رضي الله عنه হতে বর্ণিত,

أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن، فقال: «ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، فإن هم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم

নাবী ﷺ মুয়ায رضي الله عنه-কে ইয়ামান (শাসক হিসাবে) প্রেরণ করলেন, অতঃপর বললেন: তুমি সেখানকার অধিবাসীদেরকে এ মর্মে দাওয়াত দিবে যে, একমাত্র আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত প্রকৃত কোনো মাবুদ নেই এবং নিশ্চয় আমি আল্লাহর রাসূল। যদি তারা এটা মেনে নেয় তবে তাদেরকে জানিয়ে দাও যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের ওপর দিবা-রাত্রি পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয করে দিয়েছেন। যদি তারা এটাও মেনে নেয় তবে তাদেরকে জানিয়ে দাও যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের সম্পদে যাকাত ফরয করে দিয়েছেন। যা ধনীদের থেকে গ্রহণ করা হবে এবং দরিদ্রদের প্রদান করা হবে।[৬৩]

---

[৬০] *মানহাজুল ইতিদাল: ৬৪ পৃ:*
[৬১] *সূরা আন নাহল আয়াত: ১২৫*
[৬২] *সূরা ইউসুফ আয়াত: ১০৮*
[৬৩] *সহীহ বুখারী হা: ১৩৯৫*

উল্লেখিত হাদীসের প্রতি দৃষ্টি দিলে বুঝা যায় যে, দাওয়াত ও তাবলীগের মূল বিষয়বস্তু হলো তাওহীদ ও রিসালাত। কারণ নাবী ﷺ মুয়ায রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে এ মর্মে আদেশ দিলেন যে, তুমি ইয়ামানবাসীদেরকে প্রথম এক আল্লাহর একত্ত্ববাদের দিকে দাওয়াত দিবে এবং সেই সাথে আমার রিসালাত প্রাপ্তির দাওয়াত দিবে। এ দাওয়াত যদি তারা গ্রহণ করে তাহলে দৈনিক পাঁচ[৬৪] ওয়াক্ত সালাতের আবশ্যকতা জানিয়ে দাও। এটা মানলে যাকাতের আবশ্যকতা জানিয়ে দাও। অর্থাৎ তাওহীদ ও রিসালাতের ক্ষেত্রে নাবী ﷺ **أدعهم** তাদেরকে আহ্বান কর মর্মে শব্দ উল্লেখ করলেন। আর সালাত ও যাকাতের আবশ্যকতার ক্ষেত্রে **فأعلمهم** তথা তাদেরকে জানিয়ে দাও মর্মে শব্দ উল্লেখ করলেন।

অতএব দাওয়াতে দ্বীনের মূল বিষয় হলো তাওহীদ ও রিসালাত, এটা যে মেনে নিবে সালাত ও যাকাত তার উপর এমনিতেই আবশ্যক হয়ে পড়বে। কাজেই তাওহীদ ও রিসালাতমুক্ত যতো দাওয়াতী কার্যক্রম থাক না কেন সবই বিশুদ্ধ মানহাজবিরোধী প্লাটফর্ম এবং তা দলীয় ও গোষ্ঠিগত দাওয়াত ছাড়া কিছুই নয়। বর্তমান সময়ে একমাত্র সালাফী কিংবা আহলুল হাদীস ব্যতীত কেউ পূর্ণ তাওহীদ ও রিসালাতের দাওয়াতের প্রতিনিধিত্ত্ব করে না। আর প্রকৃত দাঈ তো সে যে সর্বপ্রথম মানুষকে তাওহীদের দাওয়াত দেয়।

❖ তাওহীদমুক্ত দ্বীনের দাওয়াত ধর্মীয় জাহেলিয়্যাত:

যেসব দাঈর মাঝে তাওহীদের জ্ঞান ও তাওহীদের দাওয়াত নেই এবং যেসব সংগঠনের দাওয়াতী কর্মে তাওহীদ তথা আল্লাহর একত্ববাদের আবশ্যকতা নেই, সেসব সংগঠন বা দল পূর্ণ জাহেলিয়্যাতে নিমজ্জিত। কেননা তাদের দাওয়াতী কর্মকাণ্ডে তাওহীদের অগ্রাধিকার না থাকায় তারা দ্বীনি দাওয়াতের সঠিক মানহাজ হতে বিচ্যুত। আবার দলীয় কর্মকাণ্ডকে অন্যায়ভাবে ধর্মের রূপ দেয়ায় ধর্মবিরোধী উপাধি থেকে মুক্ত। এর ফলে তাদের এমন একটা অবস্থান দাঁড়িয়েছে যে, তারা না হক্বের পথের দাঈ, আবার না বাতিলপন্থি। এমন উভয়পন্থা অবলম্বন করা সত্যই বড় জাহেলিয়্যাত ছাড়া কিছুই নয়। নাবী ﷺ বলেছেন:

«مَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عُمِّيَّةٍ يُقَاتِلُ عَصَبِيَّةً، وَيَغْضَبُ لِعَصَبِيَّةٍ فَقِتْلَتُهُ جَاهِلِيَّةٌ»

যে ব্যক্তি হক্ববিচ্যুত পতাকার নিচে যুদ্ধ বা সংগ্রাম করে, নিজের কওম বা গোষ্ঠীর সাথে যুদ্ধ করে আর এর জন্যই সে ক্রোধান্বিত হয়; তার মৃত্যু হবে জাহেলিয়্যাতের মৃত্যু।[৬৫]

এ হাদীসে উল্লেখিত বাক্য **تحت رأية عمية** এখানে **عمية** শব্দটি (**عين**) আইন বর্ণে পেশ কিংবা যের উভয়ই পড়া বৈধ।

ইমাম নাবাবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: এখানে **عمية** ইম্মিয়াতিন দ্বারা এমন দল বা গোষ্ঠি উদ্দেশ্য যাদের কর্মকাণ্ড স্পষ্ট নয় এবং উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য স্থির নয়।[৬৬]

সুতরাং তাওহীদের দাওয়াতমুক্ত সকল দল বা গোষ্ঠীর হক্ব ও বাতিলের মাঝে দুল্যমান অবস্থান ও লক্ষ্যভ্রষ্ঠ দাওয়াতী কর্মকাণ্ড ধর্মীয় অজ্ঞতা ছাড়া অন্য কিছুই নয়।

তারাই আবার সঠিক মানহাজের একনিষ্ঠ দাঈ ও তাওহীদের দিকে যারা মানুষদের আহ্বান করেন এবং শিরক ও বিদআতমুক্ত আমল করার প্রতি মানুষদেরকে জাগিয়ে তোলার কাজে ব্যস্ত রয়েছেন তাদেরকে নিয়ে কটুবাক্য ও কুমন্তব্য করতে বড্ড পারদর্শী।

মারুর বিন সুওয়াইদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

لقيت أبا ذر بالربذة، وعليه حلة، وعلى غلامه حلة، فسألته عن ذلك، فقال: إني سببت رجلا فعيرته بأمه، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: «يا أبا ذر أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية

আমি একদা রাবাযা নামক স্থানে আবু যার রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম। তখন তাঁর পরনে একজোড়া কাপড় এবং তার গোলাম বা.. (*বাকী অংশ ২৭ পৃষ্ঠায় দেখুন*)

[৬৪] *সহীহ মুসলিম হা: ১৮৪৮, সুনান নাসাঈ হা: ৪১১৫*

[৬৫] *সহীহ মুসলিম হা: ১৮৪৮, সুনান নাসাঈ হা: ৪১১৫*

[৬৬] *শারহু মুসলিম লিন নাবাবী- পৃ: ১২/২৩৮*

আমরা রাসূল ﷺ-কে ভালোবাসবো কীভাবে

আব্দুল্লাহ আরমান বিন রফিক ❄

রাসূলকে ﷺ কটূক্তির কারণে সারা বিশ্বের মুসলিমরা অভূতপূর্ব ও ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদ জানিয়েছে, ফা-লিল্লাহিল হামদ। ইসলামের সূতিকাগার আরব বিশ্ব এক্ষেত্রে সবচেয়ে কার্যকর ও অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। দেশীয় সীমারেখা ও ধর্মের গণ্ডি পেরিয়ে প্রতিবাদের দীপ্ত স্ফুলিঙ্গ এবার বিশ্ব-রাজনীতি ও অর্থনীতির ময়দানে কম্পন ছড়িয়েছে। সকল দেশের ইসলামি সংগঠন, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও নেতা, সাধারণ জনগণ, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, ব্যবসায়ী, আন্তর্জাতিক খেলোয়াড় এমনকি রাষ্ট্রীয় প্রতিবাদ ও বয়কটে ভারত সরকার বেশ কোণঠাসা ও বিব্রত। নূপুর শর্মা কর্তৃক সাম্প্রতিক এই অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনায় আমাদের হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হলেও এর মাঝে একটি ইতিবাচক বার্তা রয়েছে। রাসূলের ﷺ ভালোবাসায় এই ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদ সাক্ষ্য দেয় ইখতিলাফ, ইফতিরাক ও রাজনৈতিক মতবিরোধকে পাশ কাটিয়ে অন্তত "মৌলিক বিষয়ে" মুসলিম বিশ্বের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ঐক্য অসম্ভব নয়। প্রয়োজন শুধু আন্তরিকতা ও ঐক্যের মানসিকতা। এ ঘটনায় আরো একটি সুস্পষ্ট বার্তা হলো, মুসলিম শাসক ও জনগণ ঐক্যবদ্ধ হলে কোনো ইসলামবিরোধী পরাশক্তিকে দুর্বল করা তূলনামূলক সহজ ব্যাপার।

তবে রাসূল ﷺ-এর প্রতি আমাদের ভালোবাসা নিছক ভালোবাসা নয়, এটি ঈমানি দায়িত্ব ও ইবাদতও বটে। তাই তাঁর ভালোবাসা প্রকাশের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট শারঈ নীতিমালা রয়েছে। তাঁর প্রতি আমাদের ভালোবাসা ও আনুগত্যের মূল উদ্দেশ্য আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ও পরকালীন সফলতা লাভ।

তাই শুধু ভালোবাসি বলা ও তার অসম্মানের প্রতিবাদ জানানোর মাধ্যমেই এই লক্ষ্য অর্জন সম্ভব নয়।

❄ *সিনিয়র শিক্ষক, ডঃ এম এ বারী সালাফিয়া মাদরাসা, টাঙ্গাইল*

রাসূলের ﷺ প্রতি ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশের প্রকৃত রূপরেখার কিয়দংশ নিম্নে আলোচনা করা হলোঃ

রাসূল ﷺ ও তার রিসালাতের প্রতি পূর্ণ ঈমান ও আস্থা রাখাঃ ঈমান ও ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলোর প্রধানতম বিষয় হলো আল্লাহ ও রাসূলের ﷺ প্রতি ঈমান আনা।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ ـ رضى الله عنهما ـ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ .

ইবন উমার ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আল্লাহর রসূল ﷺ ইরশাদ করেন, ইসলামের স্তম্ভ হচ্ছে পাঁচটি।

১. আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোনো উপাস্য নেই এবং নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর রসূল-এ কথার সাক্ষ্য প্রদান করা।

২. সলাত কায়িম করা।

৩. যাকাত আদায় করা।

৪. হাজ্জ সম্পাদন করা এবং

৫. রমযানের সিয়াম পালন করা (রোজা রাখা)।

তবে এ বিশ্বাস নিছক বিশ্বাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। রাসূল ﷺ কর্তৃক আনীত বিধান সাধ্যানুযায়ী মেনে চলার চেষ্টা করা, এসব বিধানাবলীর ব্যাপারে ন্যূনতম আপত্তি না করা, পরিবর্তন ও পরিবর্ধনযোগ্য মনে না করা, অতুলনীয় জীবনব্যবস্থা হিসেবে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করা এবং যাবতীয় হক ও শর্ত মেনে চলাই হলো ঈমানের প্রকৃত বহিঃপ্রকাশ। কোনো তন্ত্র বা মতবাদকে ইসলামের চেয়ে উত্তম, সমকক্ষ কিংবা বর্তমান পৃথিবীতে ইসলামি বিধান অকার্যকর ও সেকেলে মনে করলে তার এ ঈমানের দাবি একেবারেই মূল্যহীন।

রাসূলের ﷺ আদেশ-নিষেধ মেনে চলা: ঈমানের পর এটিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমলহীন ঈমান ও আনুগত্যহীন ভালোবাসা পরকালে কোনো কাজেই আসবে না।

মহান আল্লাহ বলেনঃ

﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾

অর্থঃ "যদি তোমরা সত্যিকারের মু'মিন হয়ে থাকো তবে (দ্বিধাহীনভাবে) আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করো"।[৬৭]

﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

ভাবার্থঃ বলে দাও, 'যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, তবে আমার অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের গুনাহসকল ক্ষমা করবেন, বস্তুতঃ আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾

ভাবার্থ: "রাসূল তোমাদের যা দেন তা গ্রহণ কর, আর যা থেকে তোমাদের নিষেধ করেন তা থেকে বিরত হও এবং আল্লাহকেই ভয় কর, (জেনে রাখো) নিশ্চয় আল্লাহ শাস্তি প্রদানে অত্যন্ত কঠোর"।[৬৮]

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

أَخْبَرَنِا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، قَالاَ كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَافْعَلُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ وَاخْتِلاَفُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ " .

আবদুর রহমান ও সাঈদ ইবনু মুসাইয়্যিব (রহঃ) থেকে বর্ণিত: তাঁরা দু'জনে বলেন, আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলতেন যে, তিনি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছেন, আমি তোমাদের যা বারণ করেছি তা হতে বিরত থাকো এবং যা তোমাদের নির্দেশ করেছি তা যা সম্ভব পালন করো। কেননা, অধিক জিজ্ঞাসা ও স্বীয় নবীগণের সঙ্গে মতবিরোধ তোমাদের পূর্ববর্তীদের ধ্বংস করেছে।[৬৯]

পৃথিবীর অন্য যে কোনো মানুষের চেয়ে রাসূলকে (ﷺ) অধিক ভালোবাসাঃ সহিহ মুসলিমের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, রাসূল (ﷺ)-এর প্রতি ভালোবাসা নিজ আত্মীয়-স্বজনের প্রতি মানুষের স্বভাবসুলভ ভালোবাসার মতো নয় বরং এটি হলো ইখতিয়ারি তথা স্বেচ্ছায় জেনে-বুঝে ভালোবাসা। এ ভালোবাসার অনুভূতি হৃদয়ে জাগ্রত করা তুলনামূলক কঠিন হলেও তাঁকে সর্বাধিক ভালোবাসতো না পারলে ঈমানে পূর্ণতা আসে না। ভালোবাসার এই ঈমানী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া বেশ কঠিনই বটে। কোরআন ও সুন্নায় এর আবশ্যকতার ব্যাপারে অসংখ্য দলীল বর্ণিত হয়েছে।

মহান আল্লাহ বলেনঃ

﴿قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾

ভাবার্থঃ বল, 'তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের গোত্র, তোমাদের সে সম্পদ যা তোমরা অর্জন করেছ, আর সে ব্যবসা যার মন্দা হওয়ার আশঙ্কা তোমরা করছ এবং সে বাসস্থান, যা তোমরা পছন্দ করছ, যদি তোমাদের কাছে অধিক প্রিয় হয় আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও তাঁর পথে জিহাদ করার চেয়ে, তবে তোমরা অপেক্ষা কর আল্লাহ তাঁর নির্দেশ নিয়ে আসা পর্যন্ত। আর আল্লাহ ফাসিক সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেন না।[৭০]

কোরআনের অন্যত্র বর্ণিত হয়েছেঃ

النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ

ভাবার্থঃ নবী (ﷺ) মুমিনদের নিকট তাদের নিজেদের চেয়েও ঘনিষ্ঠ।

---

[৬৭] *সূরা আল আনফাল আয়াত: ০১*
[৬৮] *সূরা আল হাশ্‌র আয়াত: ০৭*
[৬৯] *সহীহ মুসলিম হা: ৬০০৭*
[৭০] *সূরা আত তাওবাহ আয়াত: ২৪*

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনুল কাইয়্যুম রহিঃ বলেন

ولا يتم لهم مقام الإيمان، حتى يكون الرسول أحب إليهم من أنفسهم، فضلاً عن أبنائهم وآبائهم."

অর্থঃ নিজের সকল বংশধর ও পিতৃপুরুষ অপেক্ষা রাসূলের ﷺ প্রতি ভালোবাসা অধিক না হলে ঈমান পরিপূর্ণ হয় না।[৭১]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ.

আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিতঃ আল্লাহর রসূল ﷺ বলেনঃ সেই আল্লাহর শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, তোমাদের কেউ প্রকৃত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না আমি তার নিকট তার পিতা ও সন্তানাদির চেয়ে অধিক ভালবাসার পাত্র হই।[৭২]

عن عَبْدَ اللَّهِ بْنَ هِشَامٍ، قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ إِلاَّ مِنْ نَفْسِي. فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " لاَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ ". فَقَالَ لَهُ عُمَرُ فَإِنَّهُ الآنَ وَاللَّهِ لأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي. فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " الآنَ يَا عُمَرُ ".

আবদুল্লাহ ইব্‌নু হিশাম রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, আমরা একবার নবী ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি তখন ‘উমার ইব্‌নু খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর হাত ধরে ছিলেন।, উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমার জান ছাড়া আপনি আমার কাছে সবকিছু অপেক্ষা অধিক প্রিয়। তখন নবী ﷺ বললেনঃ না, যাঁর হাতে আমার প্রাণ ঐ সত্তার কসম! তোমার কাছে আমি যেন তোমার প্রাণের চেয়েও প্রিয় হই। তখন ‘উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! এখন আপনি আমার কাছে আমার প্রাণের চেয়েও বেশি প্রিয়। নবী ﷺ বললেনঃ হে উমর! এখন তুমি সত্যিকার ঈমানদার হলে।[৭৩]

ইবনে হাজার আসক্বালানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি উক্ত হাদীসের শেষ বাক্যের ব্যাখ্যায় বলেনঃ

قال ابن حجر: أي الآن عرَفت، فنطَقت بما يجب.

অর্থঃ এখন তুমি প্রকৃত ব্যাপারটা বুঝেছো এবং ভালোবাসার আবশ্যকতা উপলব্ধি করে সঠিক কথাই বলেছো। বিশুদ্ধ সুন্নাহর প্রচার-প্রসার ও দাওয়াতি মানসিকতা লালন করা: ইসলাম শুধু নিজে পালনের জন্য নয় বরং ইসলামের বাণী সাধ্যমতো ছড়িয়ে দেওয়া উম্মাহর প্রতিটি মুসলিমের কর্তব্য। তবে সুন্নাহর প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় হলো তা বিশুদ্ধতার মানদণ্ডে উত্তীর্ণ কি-না। এক্ষেত্রে মহামতি ইমামগণ, মুহাদ্দিস, যুগশ্রেষ্ঠ বিদ্বান ও বিজ্ঞ আলেমদের নির্দেশনা মেনে চলা অতীব জরুরি। আল্লাহ বলেনঃ

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ۚ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

ভাবার্থঃ তোমরাই সর্বোত্তম উম্মাত, মানবজাতির (সর্বাত্মক কল্যাণের) জন্য তোমাদের আবির্ভূত করা হয়েছে। তোমরা সৎ কাজের আদেশ দাও এবং অসৎ কাজ হতে নিষেধ করো ও আল্লাহর প্রতি ঈমান রক্ষা করে চলো। যদি আহলে কিতাব ঈমান আনতো, তাহলে নিশ্চয়ই তাদের জন্য ভালো হতো। তাদের মধ্যে কেউ কেউ মু'মিন এবং তাদের অধিকাংশই ফাসেক।

হাদীসে বর্ণিত হয়েছেঃ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً

[৭১] روضة المحبين (২৭৬/১")

[৭২] *সহীহ বুখারী হা: ১৪*

[৭৩] *সহীহ বুখারী হা: ৬৬৩২*

'আবদুল্লাহ ইব্‌নু আম্‌র রাঃ থেকে বর্ণিতঃ নবী ﷺ বলেছেন, "আমার কথা পৌঁছিয়ে দাও, যদি তা এক আয়াতও হয়"।[৭৪]

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ

আবূ বাকরাহ রাঃ থেকে বর্ণিতঃ নবী ﷺ (হজ্জের খুতবায়) বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে উপস্থিত ব্যক্তি যেন অনুপস্থিত ব্যক্তিকে (এই বাণী বা ইল্‌ম) পৌঁছে দেয়। সম্ভবতঃ উপস্থিত ব্যক্তি এমন ব্যক্তির কাছে তা পৌঁছে দেবে, যে তার থেকে বেশি স্মৃতিধর।"[৭৫]

নবীকে কেউ অপমান কিংবা কটূক্তি করলে সাধ্যানুযায়ী ও শারঈ নীতিমালা মেনে প্রতিবাদ, প্রতিরোধ ও প্রতিশোধ গ্রহণ করাঃ এক্ষেত্রে রাসূলের ﷺ জীবদ্দশায় ঘটে যাওয়া একটি ঘটনা এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

عن ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ أَعْمَى، كَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ تَشْتُمُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَتَقَعُ فِيهِ فَيَنْهَاهَا فَلاَ تَنْتَهِي وَيَزْجُرُهَا فَلاَ تَنْزَجِرُ - قَالَ - فَلَمَّا كَانَتْ ذَاتَ لَيْلَةٍ جَعَلَتْ تَقَعُ فِي النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَتَشْتِمُهُ فَأَخَذَ الْمِغْوَلَ فَوَضَعَهُ فِي بَطْنِهَا وَاتَّكَأَ عَلَيْهَا فَقَتَلَهَا فَوَقَعَ بَيْنَ رِجْلَيْهَا طِفْلٌ فَلَطَخَتْ مَا هُنَاكَ بِالدَّمِ فَلَمَّا أَصْبَحَ ذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَجَمَعَ النَّاسَ فَقَالَ " أَنْشُدُ اللَّهَ رَجُلاً فَعَلَ مَا فَعَلَ لِي عَلَيْهِ حَقٌّ إِلاَّ قَامَ " . فَقَامَ الأَعْمَى يَتَخَطَّى النَّاسَ وَهُوَ يَتَزَلْزَلُ حَتَّى قَعَدَ بَيْنَ يَدَىِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا صَاحِبُهَا كَانَتْ تَشْتِمُكَ وَتَقَعُ فِيكَ فَأَنْهَاهَا فَلاَ تَنْتَهِي وَأَزْجُرُهَا فَلاَ تَنْزَجِرُ وَلِي مِنْهَا ابْنَانِ مِثْلُ اللُّؤْلُؤَتَيْنِ وَكَانَتْ بِي رَفِيقَةً فَلَمَّا كَانَتِ الْبَارِحَةَ جَعَلَتْ تَشْتِمُكَ وَتَقَعُ فِيكَ فَأَخَذْتُ الْمِغْوَلَ فَوَضَعْتُهُ فِي بَطْنِهَا وَاتَّكَأْتُ عَلَيْهَا حَتَّى قَتَلْتُهَا . فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " أَلاَ اشْهَدُوا أَنَّ دَمَهَا هَدَرٌ "

অর্থঃ ইবনু আব্বাস রাঃ থেকে বর্ণিত, জনৈক অন্ধ লোকের একটি 'উম্মু ওয়ালাদ' ক্রীতদাসী ছিল। সে নবী ﷺ-কে গালি দিত এবং তার সম্পর্কে মন্দ কথা বলতো। অন্ধ লোকটি তাকে নিষেধ করা সত্ত্বেও সে বিরত হতো না। সে তাকে ভর্ৎসনা করতো; কিন্তু তাতেও সে বিরত হতো না। একরাতে সে যখন নবী ﷺ কে গালি দিতে শুরু করলো এবং তার সম্পর্কে মন্দ কথা বলতে লাগলো, সে একটি ধারালো ছোরা নিয়ে তার পেটে ঢুকিয়ে তাতে চাপ দিয়ে তাকে হত্যা করলো। তার দু'পায়ের মাঝখানে একটি শিশু পতিত হয়ে রক্তে রঞ্জিত হলো। ভোরবেলা নবী ﷺ ঘটনাটি অবহিত হয়ে লোকজনকে সমবেত করে বললেনঃ আমি আল্লাহর কসম করে বলছিঃ যে ব্যক্তি একাজ করেছে, সে যদি না দাঁড়ায়, তবে তার ওপর আমার অধিকার আছে। একথা শুনে অন্ধ লোকটি মানুষের ভিড় ঠেলে কাঁপতে কাঁপতে সামনে অগ্রসর হয়ে নবী ﷺ এর সামনে এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি সেই নিহত দাসীর মনিব। সে আপনাকে গালাগালি করতো এবং আপনার সম্পর্কে অপমানজনক কথা বলতো। আমি নিষেধ করতাম কিন্তু সে বিরত হতো না। আমি তাকে ধমক দিতাম; কিন্তু সে তাতেও বিরত হতো না। তার গর্ভজাত মুক্তার মত আমার দুটি ছেলে আছে, আর সে আমার খুব প্রিয়পাত্রী ছিল। গতরাতে সে আপনাকে গালাগালি শুরু করে এবং আপনার সম্পর্কে অপমানজনক কথা বললে আমি তখন একটি ধারালো ছুরি নিয়ে তার পেটে স্থাপন করে তাতে চাপ দিয়ে তাকে হত্যা করে ফেলি। নবী ﷺ বলেনঃ তোমরা সাক্ষী থাকো, তার রক্ত বৃথা গেল।[৭৬]

عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ أَمَّنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ، إِلَّا أَرْبَعَةَ نَفَرٍ وَامْرَأَتَيْنِ وَقَالَ: «اقْتُلُوهُمْ، وَإِنْ وَجَدْتُمُوهُمْ مُتَعَلِّقِينَ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ

[৭৪] সহীহ বুখারী হা: ৩৪৬১
[৭৫] সহীহ মুসলিম হা: ৪৪৭৭
[৭৬] আবূ দাউদ হা: ৪৩৬১

মুসআব ইবন সাদ তার পিতা থেকে থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেনঃ মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ সকলকে নিরাপত্তা দান করেন, কিন্তু চারজন পুরুষ এবং দুজন নারী ব্যতীত। তিনি তাদের সম্পর্কে বলেনঃ তাদেরকে যেখানেই পাবে হত্যা করবে; যদিও তারা কাবার পর্দা ধরে থাকে.....।

রাষ্ট্রপ্রধান হিশেবে রাসূল ﷺ কর্তৃক এই দুই নারীকে হত্যার আদেশ জারি করার কারণ ছিলো তারা রাসূল ﷺ-কে ব্যঙ্গ করে গান গাইতো। ইসলামী আইন অনুযায়ী রাসূল ﷺ কে কটূক্তি করার একমাত্র শাস্তি হলো হত্যা। এক্ষেত্রে তাওবা করলে পরকালীন শাস্তি থেকে রেহাই পেলেও দুনিয়ায় দণ্ড থেকে রেহাই পাওয়ার কোনো সুযোগ নেই।

ইমাম খাত্তাবী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেনঃ

وقال الخطابي رحمه الله : "لا أعلم أحداً مِن المسلمين اختلف في وجوب قتله.

রাসূল ﷺ-কে কটূক্তিকারী কাউকে হত্যার ব্যাপারে কোনো বিদ্বান দ্বিমত করেছেন এমন তথ্য আমার জানা নেই (অর্থাৎ এ বিষয়ে কোনো মতভেদ নেই)।

তবে তাকে হত্যার দায়িত্ব সাধারণ জনগণের নয় বরং এ দায়িত্ব মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধান, শাসক, আদালত বা সরকারের।

রাসূলের ﷺ ওপর বেশি বেশি দরূদ পাঠ করাঃ

দরূদ পাঠ হলো রাসূলের ﷺ ভালোবাসা হৃদয়ে সজীব রাখার অন্যতম মাধ্যম। এটি আল্লাহকে সন্তুষ্টির অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত ও আধ্যাত্মিকতার শক্তিবর্ধকও বটে। তবে হাদীস ও সালাফে সালেহীন থেকে বর্ণিত দরূদ ব্যতীত অন্য কোনো দরূদ পড়া বিদ'আত। আল্লাহ বলেনঃ

﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾

ভাবার্থঃ নিশ্চয় আল্লাহ (উর্ধ্ব জগতে ফেরেশতাদের মধ্যে) নবীর প্রশংসা করেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর জন্য দো'আ করে। হে মুমিনগণ, তোমরাও নবীর ওপর দরূদ পাঠ কর এবং তাকে যথাযথভাবে সালাম জানাও।

ইমাম বুখারী আবুল আলিয়া থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওপর আল্লাহর সালাত বলতে বুঝানো হয়েছে ফেরেশতাদের কাছে নবীর প্রশংসা এবং ফেরেশতাদের সালাত হলো দো'আ। আর ইমাম তিরমিযী সুফিয়ান সওরী থেকে বর্ণনা করেন যে, এখানে আল্লাহর সালাত বলতে রহমত এবং ফেরেশতাদের সালাত বলতে ইস্তেগফার বুঝানো হয়েছে।[৭৭]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ ذَاتَ يَوْمٍ وَالْبُشْرَى فِي وَجْهِهِ، فَقُلْنَا: إِنَّا لَنَرَى الْبُشْرَى فِي وَجْهِكَ، فَقَالَ: " إِنَّهُ أَتَانِي الْمَلَكُ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّ رَبَّكَ يَقُولُ: أَمَا يُرْضِيكَ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي عَلَيْكَ أَحَدٌ إِلَّا صَلَّيْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا، وَلَا يُسَلِّمُ عَلَيْكَ أَحَدٌ، إِلَّا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا"

অর্থঃ আবূ তালহা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিতঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একদিন সানন্দে আমাদের কাছে আসলেন। আমরা বললাম, (আজ) আমরা আপনার চেহারায় প্রফুল্লতা দেখছি! তিনি বললেন, আমার কাছে (একজন) ফেরেশতা এসে বলল, হে মুহাম্মদ ﷺ আপনার প্রভু বলছেন যে, আপনাকে কি একথা খুশি করবে না, যে ব্যক্তি আপনার ওপর একবার দরূদ পড়বে আমি তাঁর ওপর দশটি রহমত নাযিল করব। আর যে ব্যক্তি আপনার ওপর একবার সালাম পাঠাবে আমি তাঁর ওপর দশটি শান্তি বর্ষণ করব (সালাম পাঠাব)।[৭৮]

وَعَن أُبَيِّ بنِ كَعبٍ رضي الله عنه: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم إِذَا ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيلِ قَامَ، فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، اذْكُرُوا اللهَ، جَاءَتِ الرَّاجِفَةُ، تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ، جَاءَ المَوْتُ بِمَا فِيهِ، جَاءَ المَوْتُ بِمَا فِيهِ » قُلْتُ: يَا رَسُول اللهِ، إِنِّي أُكْثِرُ الصَّلاَةَ

[৭৭] *তাফসীর ইবনে কাসীর*
[৭৮] *নাসায়ী হা: ১২৮৩*

عَلَيْكَ، فَكَمْ أَجْعَلُ لَكَ مِنْ صَلاَتِي ؟ فَقَالَ: «مَا شِئْتَ» قُلْتُ: الرُّبُع، قَالَ: «مَا شِئْتَ، فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ » قُلْتُ: فَالنِّصْف ؟ قَالَ: «مَا شِئْتَ، فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ » قُلْتُ: فالثُّلُثَيْنِ ؟ قَالَ: «مَا شِئْتَ، فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ» قُلْتُ: أَجعَلُ لَكَ صَلاَتِي كُلَّهَا ؟ قَالَ: إِذاً تُكْفَى هَمَّكَ، وَيُغْفَر لَكَ ذَنْبُكَ.

অর্থঃ উবাই ইবনে কাব ﷺ থেকে বর্ণিতঃ যখন রাতের এক তৃতীয়াংশ পার হয়ে যেত, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ উঠে দাঁড়াতেন এবং বলতেন, হে লোকসকল! আল্লাহকে স্মরণ কর। কম্পনকারী (প্রথম ফুৎকার) এবং তার সহগামী (দ্বিতীয় ফুৎকার) চলে এসেছে এবং মৃত্যুও তার ভয়াবহতা নিয়ে হাজির। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমি (আমার দো'আতে) আপনার ওপর দরূদ বেশি পড়ি। অতএব আমি আপনার প্রতি দরূদ পড়ার জন্য (দো'আর) কতটা সময় নির্দিষ্ট করব? তিনি বললেন, 'তুমি যতটা ইচ্ছা কর। আমি বললাম, এক চতুর্থাংশ? তিনি ﷺ বললেন, যতটা চাও। যদি তুমি বেশি কর, তবে তা তোমার জন্য উত্তম হবে। আমি বললাম, অর্ধেক (সময়)? তিনি বললেন, তুমি যা চাও; যদি বেশি কর, তাহলে তা ভাল হবে। আমি বললাম, দুই তৃতীয়াংশ? তিনি বললেন, 'তুমি যা চাও (তাই কর)। যদি বেশি কর, তবে তা তোমার জন্য উত্তম। আমি বললাম, 'আমি আমার (দোআর) সম্পূর্ণ সময় দরূদের জন্য নির্দিষ্ট করব! তিনি বললেন, 'তাহলে তো (এ কাজ) তোমার দুশ্চিন্তা (দূর করার) জন্য যথেষ্ট হবে এবং তোমার পাপকে মোচন করা হবে। (চলবে ইনশা আল্লাহ)

কুরআনে বর্ণিত দু'আসমূহ

ক্ষমা ও তাওবাহ

﴿رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾

"হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা ঈমান এনেছি, অতএব আমাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা কর এবং আমাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি হতে রক্ষা কর।"

(সূরা আলে ইমরান আয়াত: ১৬)

দাওয়াতে দ্বীনের পদ্ধতি ও রূপরেখা

(২১ পৃষ্ঠার পর থেকে)

ভৃত্যের পরনেও একই ধরনের একজোড়া কাপড় ছিলো। এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন: একবার আমি জনৈক ব্যক্তিকে গালি দিয়েছিলাম এবং আমি তাকে তার মা সম্পর্কে লজ্জা দিয়েছিলাম। তখন রাসূল ﷺ আমাকে বললেন: হে আবু যার! তুমি তাকে তাঁর মা সম্পর্কে লজ্জা দিয়েছ? তুমি তো এমন ব্যক্তি তোমার মধ্যে এখনও জাহেলিয়্যাতের স্বভাব রয়েছে।[৭৯]

কাজেই অশ্রধ্য ভাষায় গালি-গালাজ করা, লজ্জা ও অবমাননাকর মন্তব্য করা জাহেলিয়্যাতের স্বভাব যা আমাদের দেশের একশ্রেণীর কথিত দাঈ ও মুব্বাল্লিগদের মাঝে ব্যাপক পরিলক্ষিত একটি বিষয়। তাদের গালি-গালাজ কুমন্তব্যের প্রথম নিশানাই হলো আহলুল হাদীস কিংবা সালাফী মতাদর্শ।

এর কারণ একটাই তাদের মাঝে তাওহীদের সঠিক জ্ঞান নেই এবং তাদের দাওয়াতে তাওহীদ ও রিসালাতের উপস্থিতি নেই বিধায় তাদের দাওয়াত ও তাবলীগ ভুল মানহাজে পরিচালিত।

সুতরাং তাওহীদবিহীন দাওয়াত ও তাবলীগ এটা দাওয়াতে দ্বীন নয় বরং এটা গোষ্ঠী কিংবা দলগত দাওয়াত যা স্পষ্ট জাহেলিয়্যাত।

অতএব তাওহীদ ও রিসালাতবিহীন কোনো দল বা সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার অর্থ হলো স্বেচ্ছায় নিজেকে জাহেলিয়্যাতের মধ্যে ঠেলে দেয়া। (চলবে ইনশা-আল্লাহ)

কুরআনে বর্ণিত দু'আসমূহ

ক্ষমা ও তাওবাহ

﴿رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের নূরকে আমাদের জন্য পরিপূর্ণ করে দাও আর আমাদেরকে ক্ষমা কর; তুমি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান। *(সূরা তাহরীম আয়াত: ৮)*

[৭৯] *সহীহ বুখারী হা: ৩০*

আমি প্রবাসী

ইয়াছিন মাহমুদ বিন আরশাদ*

প্রবাস জীবন। শব্দটির সাথে আমরা খুব ভালোভাবেই পরিচিত। প্রবাস সম্পর্কে জানে না এমন মানুষ বাংলাদেশে নেই বললেই চলে। বাংলাদেশে এমনও অনেক অঞ্চল রয়েছে- যার প্রতিটি ঘরের কেউ না কেউ প্রবাসে থাকেন। বর্তমানে বিশ্বের ১৬৫টি দেশে ১ কোটিরও বেশি বাংলাদেশি কর্মী কর্মরত আছেন।[৮০]

শুধুমাত্র মধ্যপ্রাচ্যে-ই বসবাস করেন প্রায় ২৮ লাখ বাংলাদেশি প্রবাসী। যাদের অর্ধেক সৌদি আরবে ও চার ভাগের এক ভাগ আরব আমিরাতে বসবাস করেন।

প্রবাসী বলা হয় তাদেরকে, যারা কোনোদেশে জন্মগ্রহণ করার পর অন্য কোনো দেশে পাড়ি জমিয়েছেন। ভালো পরিবেশে বসবাস করা, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন ও পরিবারকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করার আশায় সাধারণত মানুষ প্রবাসে পাড়ি জমান।

প্রবাস জীবন নিয়ে রাসূল ﷺ-এর চমৎকার একটি হাদিস আছে :

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ أَخَذَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم بِمَنْكِبِي فَقَالَ كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ إِذَا أَمْسَيْتَ فَلاَ تَنْتَظِرْ الصَّبَاحَ وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلاَ تَنْتَظِرْ الْمَسَاءَ وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ.

আবদুল্লাহ ইবনু উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত: তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ ﷺ একবার আমার দু'কাঁধ ধরে বললেন: তুমি দুনিয়াতে থাকো যেন তুমি একজন প্রবাসী অথবা পথচারী। ইবনু উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু বলতেন, তুমি সন্ধ্যায় উপনীত হলে আর সকালের অপেক্ষা করো না এবং সকালে উপনীত হলে আর সন্ধ্যার অপেক্ষা করো না। তোমার সুস্থতার সময় তোমার অসুস্থাবস্থার জন্য প্রস্তুতি নাও। আর তোমার জীবিত অবস্থায় তোমার মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি নাও।[৮১]

উদাহরণ দেওয়ার মত হাজারটি বিষয় থাকা সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ ﷺ এ-পৃথিবীতে একজন মুমীনের জীবনযাপন কেমন হবে তা বোঝাতে দুটি বিষয় চয়ন করেছেন: ১. প্রবাস জীবন, ২. একজন পথচারীর জীবন।

রাসূল ﷺ কেন এ-দুটি বিষয়ের উদাহরণ টানলেন, তা বুঝতে আমাদেরকে বিষয় দুটোর বাস্তবচিত্র সম্পর্কে চিন্তা করতে হবে ।

প্রথমত, প্রবাস জীবন। প্রবাস জীবনের ইতিহাস যেমন প্রাচীন, তেমনি প্রাচীন প্রবাসের দুঃখ-দুর্দশার ফিরিস্তি।

অনেক মানুষ নিজের ভিটে-বাড়ি বিক্রি করে পাড়ি জমান পরবাসে। আপনজন ছেড়ে হাজার কিলোমিটার দূরে, দিনের পর দিন কঠোর পরিশ্রম করেও মেলে না সুখের দেখা। দেশে বা পরবাসে সবখানেই তারা নানাভাবে নিগ্রহের শিকার হন। এতসব সমস্যার পরেও তারা থেমে যান না; নিজ দেশে একটু ভালো থাকা, নিজ পরিবারকে একটু ভালো রাখার প্রচেষ্টায় তারা আমরণ যুদ্ধ করে যান।

দেশে একজন শ্রমিকের মাসিক আয় যখন পনের থেকে বিশ হাজার টাকা তখন একজন প্রবাসীর আয় চল্লিশ থেকে ষাট হাজার টাকা। একজন প্রবাসী চাইলেই এ-টাকা আনন্দ-ফুর্তি করে কাটাতে পারতেন, যাপন করতে পারতেন আয়েশি জীবন। কিন্তু তিনি সেটা না-করে খুঁজে নেন স্বল্প ভাড়ার ছোটখাটো একটা ঘর, খেয়ে না-খেয়ে সারাদিন কাজ করেও রাত্রি বেলায় ওভারটাইম করেন একটু বাড়তি আয়ের আশায়। কারণ তিনি ভাবেন, এ-দূর প্রবাসে আমি চিরকাল থাকতে আসিনি। আসিনি এ-রঙিন শহরে রঙের মেলায় হারিয়ে যেতে। দেশের সেই ছোট্ট কুটিরটি

* শিক্ষক: মাদরাসা খাইরুল উম্মাহ, চট্টগ্রাম।

[৮০] প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থানমন্ত্রী নুরুল ইসলাম বিএসসি। February ১৩, ২০১৮

[৮১] সহীহ বুখারী হা: ৬৪১৬

একটু সাজানোর ইচ্ছে নিয়ে এসেছিলাম। যত দ্রুত সম্ভব সেখানেই ফিরে যাবো। তাই প্রবাসের আয়েশের কথা না-ভেবে ঘর সাজাবার উপকরণ জোগাড়েই তার মনোযোগ থাকে বেশি। ক্ষণস্থায়ী এ-ধরার বুকে আমাদের চিন্তা-ভাবনা হওয়া উচিত সে প্রবাসীর মতই। হাদীসে সেদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, পথচারী। পথচারীর উদাহরণ একটি কাল্পনিক ছোটগল্প থেকে আমরা খুব সহজেই বুঝে নিতে পারি । ধরুন, ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম যাবেন বলে বের হয়েছেন। স্টেশনে পৌঁছে টিকিট কেটে নিলেন, কিন্তু ট্রেন এখনো প্লাটফর্মে এসে পৌঁছেনি। ট্রেনের অপেক্ষায় ওয়েটিং রুমে প্রবেশ করলেন, কিন্তু সেখানে ঘোর অন্ধকার। এত অন্ধকারে বসে থাকা যায়? পাশের দোকান থেকে একটি লাইট কিনে আনলেন। লাইট জ্বালাতেই দেখতে পেলেন পুরো রুম ধুলোবালিতে ছেয়ে আছে। বাহির থেকে একটি ঝাড়ু নিয়ে সব পরিষ্কার করলেন। রুমের ভেতর খুব গরম। কোনো বৈদ্যুতিক পাখারও ব্যবস্থা নেই। অনেকটা বিরক্তি নিয়েই একটি হাত পাখা কিনে আনলেন। ওয়েটিং রুমের এতসব ঝামেলা শেষ করতে গিয়ে বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। হাতপাখা নাড়তে নাড়তে একটু বিশ্রাম নেবেন বলে যেই-না চোখটা বন্ধ করেছেন, অমনি ট্রেনের আগমনধ্বনি! জোর সাইরেন বাজিয়ে প্ল্যাটফর্মে এসে হাজির ট্রেন! এবার চলে যাবার পালা। একটু বিশ্রামের আশায় এতসব ঝামেলা পোহালেন ঠিকই, কিন্তু সে বিশ্রাম আর হলো কই? বিদায় ঘণ্টা যে বেজে গেছে, চলে যেতেই হবে! আচ্ছা প্ল্যাটফর্মের বেঞ্চিতে বসলেও কি আপনার সময়টা কাঁটতো না? ওয়েটিং রুমের এতসব সাজগোছের আসলেই কি প্রয়োজন ছিল? জমে থাকা ধুলো-ময়লা গুলোও কি বলে দেয় না, তুমি মুসাফির! আমার বুকে ঠাঁই নেবার কোনো প্রয়োজন তোমার নেই বলেই আমি ধুলো-মলিন?

এভাবেই হাজারো ব্যস্ততার মাঝে কাটে আমাদের ছোট্ট জীবন। পরকালের পাথেয় গোছাবার সময় ক'জনের ভাগ্যে জোটে? তাই তো রাসূল ﷺ অসংখ্য হাদীসে আমাদেরকে দুনিয়ার জীবন সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। রাসূল ﷺ বলেন:

﴿إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ فَاتَّقُوا الدُّنْيَا﴾

অবশ্যই দুনিয়াটা চাকচিক্যময় মিষ্টি ফলের মতো আকর্ষণীয়। আল্লাহ তা'আলা সেখানে তোমাদেরকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করেছেন। তিনি লক্ষ্য করছেন যে, তোমরা কীভাবে কাজ করো। অতএব তোমরা দুনিয়াকে এড়িয়ে চলো।[৮২]

নশ্বর এ পরবাসে আমি এক মুসাফির। নিজ দেশের কথা ভুলে ডুবে আছি প্রমোদ মায়ায়। প্রতিদিনই ভাবি ফিরে যাবো। নীড় সাজানোর সব প্রস্তুতি শুরু করবো শিগগিরই। কিন্তু আবারো হারিয়ে যাই লক্ষ্যহীন এক ঘূর্ণিপাকে। আদৌ কি পাবো সব প্রস্তুতি শেষ করে দেশে ফেরার সুযোগ? নাকি ফিরে যাবো খালি হাতেই।

আল্লাহ তা'আলা প্রতিটি রেমিট্যান্স যোদ্ধাকে ভালো রাখুন এবং আমাদের সকলের জন্য আখেরাতের স্থায়ী নীড় সাজানোর প্রতিটি পদক্ষেপ সহজ করুন। ▣▣

এজেন্ট- গ্রাহক হওয়ার আহ্বান

"মাসিক তর্জুমানুল হাদীস"

প্রত্রিকার গ্রাহক/এজেন্ট হতে আগ্রহীদের পূর্ণ নাম ও ঠিকানা গ্রাহক ফি ৩৬০/- (তিনশত ষাট টাকা) প্রেরণসহ। যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

যোগাযোগ:

৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা-১২০৪
মোবাইল : ০১৯৩৩-৩৫৫৯০৮

ফেসবুক পেইজ
https://www.facebook.com/tarjumanulhadeeth/

ওয়েবসাইট
http://www.jamiyat.org.bd/

[৮২] সহীহ মুসলিম হা: ৬৮৪১

দৃষ্টিনন্দন প্রাসাদ

সাইদুর রহমান*

বাড়ি, বাড়ি, হ্যাঁ বাড়ি। দৃষ্টিনন্দন একটি সোনালী বাড়ির স্বপ্ন সকলেই অন্তরে বুনন করে থাকে। সবাই এমন বাড়ির মালিক হতে চায়। এমন লোক খুঁজে পাওয়া দায়, যারা এমন বাড়ির অধিকারী হতে চায় না।

মানুষ জীবনের সবটুকু দিয়ে একটা বাড়ি তৈরি করতে চায়। কারো ভাগ্যে জোটে আবার কারো ভাগ্যে জোটে না। ঐকান্তিক প্রচেষ্টার পরেও স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যায়। শুধু মানসপটে হাতছানি দিয়ে ডাকে।

এই প্রত্যাশিত বাড়িটি না পেয়ে অনেকে হীনম্মন্যতায় ভোগে। আজ আপনাদের এমন একটি বাড়ির সন্ধান দিবো, যা কখনো কল্পনায় ও অনুভবে আসে না। যে বাড়ি পার্থিব চক্ষু কোনো দিন দেখেনি। আর দেখারও যোগ্যতা রাখে না।

যে বাড়ির একেকটা ইট হবে স্বর্ণ রৌপ্যের, বিভিন্ন কারুকার্যমণ্ডিত। হরহামেশা মৃদুমন্দ হিম সমীরণ প্রবাহিত হবে। বাড়ির সামনে থাকবে নয়নাভিরাম, চোখ ধাঁধানো প্রস্রবণ ঝরনাধারা; থাকবে জলের ফোয়ারা।

জলের অস্ফুট ছলাত ছলাত কলতানে পুলক অনুভব করবে বাড়ির মালিক; তার হৃদয়ে প্রশান্তির হিল্লোল বইবে। বাড়ির আঙিনায় থাকবে বাহারি পুষ্প কানন।

এই কাননে এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে ঘোরাঘুরি করতে থাকবে নানা প্রজাতির প্রজাপতি ও ভ্রমর। এ ফুল থেকে ওই ফুলে পরাগরেণু নিয়ে করবে ছোটাছুটি। মাঝে মাঝে ভিড়াভিড়িতে ঠেস লেগে যাবে।

পাখির গানে সিক্ত হবে অন্তর। ডানা মেলে গাইতে মন চাইবে তাদের সূরে।

বুঝতে পেরেছি, পাঠকদের আর তর সইছে না। এমন অনিন্দ্য সুন্দর প্রাসাদের অধিকারী হতে মন চাইছে । হ্যাঁ, আমি আপনাকে সব বলবো, একটু ধৈর্য ধরে শুনুন। আপনার জন্যেই আমার এই প্রয়াস।

পাঠক আশ্চর্য হবেন! এই বাড়ি তৈরি করতে দুনিয়ার বাড়ির মতো পয়সা খরচ করতে হয় না; অসম্ভব পরিশ্রমেরও প্রয়োজন হয় না। শুধু প্রয়োজন সদিচ্ছা ও অটুট মনোবল যে কোনো ব্যক্তিই তা করতে পারবে; কোনো ধরাবাধা নেই।

জান্নাতে এই সুরম্য প্রাসাদ নির্মাণ করতে চাইলে কিছু আমল করতে হবে। ভয় পাওয়া বা ঘাবড়ানোর কোনো কারণ নেই। আমলগুলো একেবারই সহজ।

আরে ভাই, বাড়ি তৈরি না করলে জান্নাতে থাকবেন কোথায়? জান্নাতে প্রসারিত মাঠ প্রান্তর পড়ে আছে। এগুলোকে বসবাস উপযোগী করে তুলুন নিজ আমল দিয়ে। আর কালক্ষেপণ না করে চলুন জান্নাতে বাড়ি তৈরি শুরু করি। নবী ﷺ বলেছেন,

" مَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِدًا بَنَى اللَّهُ لَهُ مِثْلَهُ فِي الْجَنَّةِ "

"যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে একটি মসজিদ তৈরি করবে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জান্নাতে অনুরূপ একটি ঘর তৈরি করবেন।"[৮৩]

কী পাঠক, আপনি দুঃখ পেলেন? টাকা কড়ি নেই, আমি কীভাবে মসজিদ বানাবো? আপনি আপনার সামর্থ্যানুযায়ী যতটুকু পারেন মসজিদ নির্মাণে সহযোগিতা করুন।

আরে ভাই, আল্লাহ তো আপনার মন দেখেন। আপনার হৃদয়ের ব্যাকুলতা আল্লাহ চান। আল্লাহ তা'আলা আমাদের ইবাদতের প্রতি মুখাপেক্ষি নন। তিনি যদি আমাদের ইবাদতের প্রতি মুখাপেক্ষি হতেন, তাহলে যেসব মানুষ তার ইবাদত করে না, তিনি তাদের কখনো জীবিকা দান করতেন না। নবী ﷺ বলেছেন,

لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ مَا سَقَى كَافِرًا مِنْهَا شَرْبَةَ مَاءٍ

"আল্লাহ্ তা'আলার নিকট যদি এ পৃথিবীর মূল্য মশার একটি ডানার সমান হতো, তাহলে তিনি কোনো কাফিরকে একফোঁটা পানি পান করার অবকাশ দিতেন ।"[৮৪]

---

* শিক্ষক: জামিয়া সালাফিয়া, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

[৮৩] জামে আত-তিরমিযী হা: ৩১৮

আপনি মসজিদ বানান বা না বানাব, এতে আল্লাহর কী লাভ! আপনি নিরাশ হবেন না। দান করে যান, আল্লাহ অবশ্যই আপনার জন্যেও একটি বাড়ি নির্মাণ করবেন।

একেবারে দরিদ্র হলে এই আমলটা তো করতে পারবেন, তাই না? রাসূল ﷺ বলেছেন,

مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثِنْتَىْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الْفَجْرِ

"যে ব্যক্তি দিন রাতে বার রাক'আত সালাত আদায় করবে, তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরি করা হবে। যুহরের (ফরজ সালাতের) পূর্বে চার রাক'আত ও পরে দুই রাক'আত, মাগরিবের (ফরজ সালাতের) পরে দুই রাক'আত, ইশার (ফরজ সালাতের) পরে দুই রাক'আত এবং ভোরে ফজরের সালাতের পূর্বে দুই রাক'আত।"[৮৫]

এখন থেকে বরাবরের মতো এই আমলগুলো করে যাবেন। কোনো ধরনের খামখেয়ালি যেন আপনাকে পেয়ে না বসে।

বাজারে গিয়েও জান্নাতে ঘর তৈরি করতে পারবেন। অবাক হচ্ছেন? ভ্রু কুঁচকে তাকিয়ে আছেন? আদতে অবাক হবারই কথা! এই হৈচৈ কোলাহলপূর্ণ ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ পরিবেশে এতো সুন্দর বাড়ি তৈরি করা সম্ভব? আপনাকে ভাবনার দরিয়ায় অবগাহনের নিমিত্তে হাদীসটা নিয়ে আসলাম, নবী ﷺ বলেছেন,

مَنْ قَالَ حِينَ يَدْخُلُ السُّوقَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَىٌّ لاَ يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ كُلُّهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ - كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ حَسَنَةٍ وَمَحَا عَنْهُ أَلْفَ أَلْفِ سَيِّئَةٍ وَبَنَى لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ .

"যে ব্যক্তি বাজারে প্রবেশকালে বলে, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু য়ুহয়ী ওয়া য়ুমীতু ওয়া হুয়া হায়্যুন লা ইয়ামূতু বিয়াদিহিল খাইর কুল্লুহু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শায়ইন কাদীর" (আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নাই, তিনি এক, তাঁর কোনো শরীক নাই, রাজত্ব তাঁরই এবং সমস্ত প্রশংসা তাঁরই। তিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু দেন। তিনি চিরঞ্জীব, কখনো মরবেন না, তাঁর হাতেই সমস্ত কল্যাণ নিহিত এবং তিনি সব কিছুর উপর সর্বশক্তিমান), আল্লাহ তার আমলনামায় এক লাখ পুন্য লিপিবদ্ধ করেন, তাঁর এক লাখ গুনাহ মাফ করেন এবং তার জন্য জান্নাতে একটি প্রাসাদ তৈরি করেন।"[৮৬]

আশ্চর্য হচ্ছেন পাঠক! এতো ছোট্ট একটা দোয়া আর এর সাওয়াব কত বড়! আমি আগেও বলেছি, আল্লাহ আপনার মনের দিকে তাকান। বাজারে এতো ভিড়া ভিড়িতে আপনি তাঁকে ভুলে যান কিনা; কিন্তু না, শত ব্যস্ততার মাঝেও আপনি তাঁকে ভুলে যাননি। তাই প্রাচুর্যের অধিকারী মহান রব আপনাকে উত্তম বদলা দিয়েছেন। আরো একটি বাড়ি নির্মাণ করুন।

নবী সাল্লাল্লাহু ﷺ বলেছেন,

مَن سدَّ فَرجةً رفعَهُ اللَّهُ بِها درجةً وبنى لَهُ بيتًا في الجنَّةِ

"যে ব্যক্তি কাতারের ফাঁকা বন্ধ করবে, আল্লাহ তার মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন এবং জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করবেন।"[৮৭]

প্রত্যেক দিন আপনি পাঁচটি করে জান্নাতে বাড়ি তৈরি করতে পারবেন। শুধু আপনি সালাতের কাতারের ফাঁক বন্ধ করবেন। কত সহজ, তাই না?

নবী ﷺ বলেছেন,

من قرأ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ عشرَ مراتٍ بنى اللهُ له بيتًا في الجنَّةِ

"যে ব্যক্তি দশবার কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ[৮৮] পাঠ করবে, জান্নাতে আল্লাহ তার জন্যে একটি বাড়ি নির্মাণ করবেন।" [৮৯]

[৮৪] *জামে আত-তিরমিযী হা: ২৩২০*
[৮৫] *জামে আত-তিরমিযী হা: ৪১৫*
[৮৬] *সুনানে ইবনে মাজাহ হা: ২২৩৫*
[৮৭] *মুসনাদে আহমাদ হা: ২৪৫৮৭*
[৮৮] *সূরা আল ইখলাস*
[৮৯] *সহীহুল জামে হা: ৬৪৭২*

আপনি নির্দিষ্ট একটা সময় বের করুন। এ সময় এই সূরাটা দশবার পড়বেন। হতে পারে সময়টা হবে নিঝুম রাতে দুরাকাশে স্নিগ্ধ জোছনার প্রতি তাকিয়ে বিড়বিড় করে পড়বেন অথবা ঘুমের প্রাতে লাইট অফ করে নিজ গুনাহের কথা স্মরণ করে নিরবে নিভৃতে পড়বেন বা ব্যস্ত জীবনে শত কাজের ফাঁকে একটু অবসর পেয়ে।

গদ্যময় জীবনের পেছনে অনেক সময় নষ্ট করেছেন, এবার ফিরে আসুন পদ্যময় জীবনের তরে। আমাদের জীবনের বাঁকে বাঁকে অনেক সময় মাঝে মাঝে উঁকি ঝুঁকি দেয়; কিন্তু আমরা ওই সময়গুলো বেখেয়ালি অযথা কাজে নষ্ট করে দেই। আজ থেকে কিন্তু আর সময় নষ্ট করলে চলবে না। মনে থাকবে? চলুন আরো কিছু বাড়ি তৈরির আমল জেনে নেই।
নবী ﷺ বলেছেন,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِ قَالَ اللَّهُ لِمَلاَئِكَتِهِ قَبَضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِي . فَيَقُولُونَ نَعَمْ . فَيَقُولُ قَبَضْتُمْ ثَمَرَةَ فُؤَادِهِ . فَيَقُولُونَ نَعَمْ . فَيَقُولُ مَاذَا قَالَ عَبْدِي فَيَقُولُونَ حَمِدَكَ وَاسْتَرْجَعَ . فَيَقُولُ اللَّهُ ابْنُوا لِعَبْدِي بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَسَمُّوهُ بَيْتَ الْحَمْدِ "

"কোনো বান্দার সন্তান মারা গেলে, তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর ফেরেশতাদের প্রশ্ন করেন, তোমরা আমার বান্দার সন্তানকে কি ছিনিয়ে আনলে? তারা বলে, হ্যাঁ। পুনরায় আল্লাহ তা'আলা প্রশ্ন করেন, তোমরা তার হৃদয়ের টুকরোকে ছিনিয়ে আনলে? তারা বলে, হ্যাঁ। পুনরায় তিনি প্রশ্ন করেন, তখন আমার বান্দা কী বলেছে? তারা বলে, সে আপনার প্রশংসা করেছে এবং ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন পাঠ করেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, জান্নাতের মধ্যে আমার এই বান্দার জন্য একটি ঘর তৈরি করো এবং তার নাম রাখ 'বাইতুল হামদ' বা প্রশংসালয়।[৯০]

পাঠক আমরা অকপটে স্বীকার করি, এ মুহূর্তে ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল; তথাপি যদি আপনি ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করতে পারেন, তাহলে অবশ্যই আপনি এই মহাপুরস্কারের অধিকারী হবেন।

[৯০] *জামে আত-তিরমিযী হা: ১০২১*

ধরুন কিছু দিনের জন্য আপনাকে আমি একটা কাপড় ধার দিলাম। আমি যদি এটা ফেরত চাই, আপনি কি আমার উপর রাগ করবেন? কক্ষনো না। এটা করলে সবাই আপনাকে বোকা নির্বোধ বলবে।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের চোখ শীতলকরণে সন্তান দান করেন। আবার মাঝে মাঝে আমাদের পরীক্ষা করেন। প্রয়াণ যায় আমাদের সাতরাজার ধন।

যখন সন্তানের মোহে আমরা আল্লাহকে ভুলে যাই, তাঁকে গুরুত্ব কম দেই, তার আদেশ অমান্য করি, কিছু সময় তার অর্চনায় মশগুল থাকি না, তখন তিনি চান যেন আমরা তাঁর তরে ফিরে আসি। তাকে ভালোবাসি।

এজন্যই তিনি বিপদাপদ দিয়ে থাকেন। যখন আমরা তাঁর দিকে রুজু হই, তখন আমাদের তিনি উত্তম জিনিসের ব্যবস্থা করে দেন।

অনেক বিষয় আমাদের চিত্তের পরিপন্থি, অথচ এটা রবের কাছে প্রিয়। আমরা চাই এটা করতে, এটা নিতে। রব জানেন এটা আমার জন্য ক্ষতিকারক, তখন তিনি আমাদের কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য করে প্রিয় বস্তুটি উঠিয়ে নেন বা আমাদের মর্জি মাফিক দেন না।

বাচ্চা পুকুর ধারে পানি নিয়ে খেলা করতে পছন্দ করে। আপনি কি আপনার প্রিয় আদরের দুলালকে পুকুরের ধারে পানি নিয়ে খেলা করার জন্য ছেড়ে আসবেন? বলবেন, আব্বু তুমি মজা করে খেল, আমি চললাম। কখনো এটা আমাদের দ্বারা হবে না।

বাচ্চার অশ্রুজলেও ওই সময় আমাদের হৃদয়ে মায়াজাল স্থান পাবে না। বাচ্চার হাজারো লাথি ঘুষি খেয়ে আপনি তাকে পানি থেকে উঠিয়ে নিয়ে আসবেন।

আমরা অনেক সময় না জেনে প্রবল ঊর্মিমালায় বেষ্টিত সমুদ্রে ছোট্র তরি নিয়ে যাত্রা করি।

আমাদের কাছে এই ভ্রমণটা খুবই আকর্ষণীয়। আমাদের অন্তরাত্ম চায় এই ভ্রমণে যেতে; অথচ আল্লাহ জানেন মাঝ সমুদ্রে গেলেই আমরা বিপদের সম্মুখিন হবো। বিশাল তরঙ্গ ক্ষীণকায় তরিকে ভেঙে চুরমার করে দিবে। আছড়ে দিবে পানির গহ্বরে। চিরতরে শেষ করে দিবে জীবনায়ু।

তাই আল্লাহ তা'আলা মসিবতের সম্মুখিন হওয়ার আগেই আমাদের বাধা দেন। কিন্তু আমরা না জেনে তাঁকেই দোষারোপ করি। রুষ্ট হই তাঁর উপর। অভিযোগের বন্যা বইয়ে দেই তাঁর উপর। আরো একটি বাড়ি নির্মাণ করা যাক।
নবী ﷺ বলেছেন,

أنا زَعِيمُ بَيتٍ في رَبَضِ الجنةِ، لِمَنْ تَرَكَ المِـراءَ وإنْ كان مُحِقًّا، وبَيتٍ في وسَطِ الجنةِ لِمَنْ تَـرَكَ الكَـذِبَ وإنْ كان مازِحًا، وبَيتٌ في أعلى الجنةِ لِمَنْ حَسُنَ خُلُقُهُ.

"যে ব্যক্তি কোনো বিষয়ের উপযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও তর্ক বর্জন করবে, জান্নাতের উপকণ্ঠে তার জন্য একটি বাড়ি নির্মাণ করা হবে।

যে ব্যক্তি মজা করেও মিথ্যা বলবে না, জান্নাতের মধ্যভাগে তার জন্য একটি বাড়ি নির্মাণ করা হবে। যার চরিত্র সুন্দর, জান্নাতের শীর্ষে তার জন্য একটি বাড়ি নির্মাণ করা হবে। এ ব্যাপারে আমি দায়িত্ব নিলাম।"[৯১]

ভাই আমরা যদি একটু নিজেকে সংযত রাখতে পারি, ঝগড়া বিবাদ এড়িয়ে চলি, কটু কথার প্রত্যুত্তরে মুচকি হাসি উপহার দিতে পারি, তাহলে জান্নাতে আমাদের জন্য আল্লাহ তা'আলা নয়ন জুড়ানো বাড়ি নির্মাণ করবেন।

বিনয় নম্রতার পথ কিন্তু ভাই এবড়োথেবড়ো কণ্টকাকীর্ণ বন্ধুর পথ। এ পথে হাঁটা খুব মুশকিল। মাঝে মাঝে তো রাগ আপনার আপাদমস্তক ছেয়ে যাবে। নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করা একটু কষ্ট হয়ে যাবে। মন চাইবে কষিয়ে বসিয়ে দেই এক থাপ্পড়। আমার তো গায়ে তারুণ্যের শক্তি সঞ্চিত আছে, ক্ষমতার দাপটও যথেষ্ট আছে।

প্রতিশ্রুত শত্রু শয়তান আপনাকে প্রলুব্ধ করবে। তোমার মতো এতো প্রতাপশালী দুর্দান্ত ব্যক্তির সাথে সাধারণ এক রিকশাচালক তেড়ে উঠে। লাথি দিয়ে ওর হাড়হাড্ডি ভেঙে দাও।

নিজের রাগ একটু প্রশমিত করুন। তবেই তো জান্নাতে বাড়ি তৈরি করা হবে। শ্রমিক একশো টাকা বেশি চেয়েছে, আপনার সাথে একগুঁয়ে আচরণ করছে। রাগে আপনার গর্দানের রগ স্ফিত হয়ে গেছে। মাথা একটু শীতল করুন নবীর শেখানো দু'আর পানি ঢেলে।

প্রবৃত্তি ও শয়তান যেন কোনো অবস্থাতেই বিজয়ীর গোল্ডেন মেডেল না পায়। তাহলে আপনি ঝগড়া বিবাদ এড়িয়ে চলবেন, ঠিক আছে?

মাঝে মধ্যে তো বন্ধুদের হাসানোর উদ্দেশ্যে বা গল্পের আসর মাতানোর জন্য আমরা মিথ্যার স্রোত বইয়ে দেই। নিজের মাঝে একটু প্রশান্তি অনুভব করি, যখন দেখি আমার কথা শুনে বন্ধু মহল হো হো করে হাসছে।

দেদারসে মিথ্যার ঝুলি উন্মোচন করছি। একবারও বিবেকের দ্বার উন্মুক্ত করি না এর আখেরি রেশ কী হতে পারে! আল্লাহ তা'আলা তো এই জিভকে তীক্ষ্ণ ধারালো ছুরি দিয়ে ক্যোচুক্যাট করে কেটে দিবেন।

বন্ধুদের হাসিয়ে আমার কী লাভ? মহাপ্রলয়ের দিন যদি বন্ধুদের বলেন আমি তো বেহুদা কথা বলে তোমাদের চিত্তরঞ্জন করেছি। এখন আমাকে একটু সাহায্য করো! তখন বন্ধুরা ঠাস করে বলে উঠবে, "তোমাকে আমরা হাসাতে বলেছিলাম? তুমি তো নিজ থেকেই আমাদের প্রিয়পাত্র হওয়ার জন্য এ কাজ করেছো। আমাদের দোষ দিচ্ছ কেন এখন?"

তারা বেমালুম ভুলে যাবে আপনার কথা। তাহলে এখন কী করতে হবে? মিথ্যা কথা পরিহার করতে হবে, ঠিক আছে? জান্নাতে তাহলে আপনাআপনি বাড়ি তৈরি হতে থাকবে।

চরিত্র যদি কোমল করতে পারি, মানুষের সাথে চলাফেরার ক্ষেত্রে যদি ভদ্রোচিত আচরণ করতে পারি। মানুষ দেখে যেন ভালো মনে করে। জীবনকে যদি নিষ্কলুষতার আদলে, ভদ্রতার চাদরে আবৃত করতে পারি, তাহলে ইহলৌকিক জগতে পাবো আপামর জনতার ভালোবাসা আর পরকালে পাবো শান্তির নীড় জান্নাতী বাড়ি।

পাঠক চলুন এবার একটু কষ্ট করে আমলগুলো করি। আপনি তো বন্ধুর আড্ডায় বেখেয়ালিপনায় অনেক সময় অবহেলায় নষ্ট করে ফেলেন। কিছু সময় বের করে আমলগুলো করে জান্নাতে বাড়ি নির্মাণ করুন।

[৯১] *সহীহুল জামে হা: ১৪৬৪*

হাসপাতালে ভিড়ে দাঁড়িয়ে আছেন, নড়াচড়া করার কোনো কায়দা নেই। ভিড় ঠেলে সামনে যেতেও পারছেন না, গরমে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন আপনি। আত্মাকে একটু প্রবোধ দিয়ে বিড়বিড় করে দশবার সূরা ইখলাস পাঠ করুন। আপনার জন্য জান্নাতে একটি বাড়ি নির্মাণ করা হবে।

অফিসে কাজ নেই, একা একা আনমনে বসে আছেন। আকাশটাও আবার গুমোট হয়ে আছে, কলিগরা সবাই যারযার বাসায় চলে গেছে। আপনিও চলে যান, তবে ফিরতি পথে দশবার সূরা ইখলাস পাঠ করুন।

আপনার কলিগরা তো এই আমলগুলো সম্পর্কে বেখবর। আপনি তো জেনেছেন। আমলের প্রতি অগ্রসর হন।

স্ত্রীর বকুনিতে আর পেরে উঠলেন না, উপায়ান্তর না পেয়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাজারে যেতে হয়েছে। তাই কী হয়েছে, সেখানে গিয়েই বাড়ি তৈরি করুন। বাজারে ঢুকেই দোআটা পড়ে ফেলুন।

প্রিয়তম স্বামী আছে প্রবাস জীবনে। একা একা বসে থেকে সময় ফুরায় না। মন চলে যায় অজানা অদেখা গন্তব্যে। মাঝে মাঝে তো মন বিষণ্নতায় ছেয়ে যায়। ওই সময় কারো সাথে চ্যাট করতে মন চায়, অবলা কথাগুলো ব্যক্ত করতে মনে সায় দেয়। শয়তানের এই প্রবঞ্চনা থেকে দূরে সরে বারো রাকাত সুন্নাতের প্রতি মনোযোগী হন। হৃদয়ের সবটুকু দিয়ে জান্নাতে বাড়ি তৈরি করার চেষ্টা করুন।

কাজকর্ম শেষ করে পড়ন্ত বিকেলে প্রশান্তির কেদারায় বেলকনিতে বসে আছেন। গায়ে গতরে শক্তি আছে, ফুরসতও আছে পর্যাপ্ত পরিমাণ। আল্লাহর ধ্যানে আত্মমগ্ন হন। অবসর সময় পেলেই ইবাদতে মশগুল হন। আল্লাহ বলছেন, 'ফুরসত পেলেই তোমার প্রতিপালকের ইবাদতে মশগুল হও।, [৯২]

এমন হতে পারে বিকেল গড়ানোর আগেই আপনি অসুস্থ হয়ে যেতে পারেন বা চলে যেতে পারেন না ফেরার দেশে। এজন্যই নবী ﷺ উম্মতকে উদ্দেশ করে বলেন,

اغتَنِم خَمسًا قبلَ خَمسٍ حياتَك قبلَ موتِكَ وصحَّتَك قبلَ سِقَمِك وفراغَك قبلَ شُغْلِكَ وشبابَكَ قَبلَ هَرَمِك وغناكَ قبلَ فقرِكَ

'পাঁচটি বিষয় আসার পূর্বে পাঁচটি বিষয়কে কদর করবে। ১) মৃত্যু আসার পূর্বে জীবিতাবস্থাকে, (২) রোগ ব্যাধি গ্রাস করার পূর্বে সুস্থতাকে, (৩) অতিব্যস্ত হওয়ার পূর্বে অবসর সময়কে, (৪) বার্ধক্যে উপনীত হওয়ার পূর্বে তারুণ্যকে ও (৫) দৈন্যদশা আসার পূর্বে সচ্ছলতাকে।"[৯৩]

নিজেকে সদা ইবাদতের প্রতি ব্যতিব্যস্ত রাখবেন। কোনো অবস্থাতেই যেন সময় অপচয় বা অপব্যবহার না হয়। আমরা প্রায় সবাই একটা প্রবাদবাক্য জানি, 'বেকার মস্তিষ্ক শয়তানের ঘর,। আপনি অযথা বসে থাকবেন না। কোনো কাজে আত্মনিয়োগ করুন। বসে থাকলেই শয়তান আপনাকে পাপের কাজের প্রতি প্রলুব্ধ করবে। আল্লাহ আপনার মঙ্গল করুন, এই আশা ব্যক্ত করে লেখার ইতি টানছি।▣▣

লটকন

ইংরেজি নাম: Burmese grape
বৈজ্ঞানিক নাম: Baccaurea sapida
জাত: বারি লকটন- ১ ও বাউ লটকন- ১
পুষ্টিগুণ: লটকন অম্লমধুর ফল। ফল খেলে বমি বমি ভাব দূর হয় ও তৃষ্ণা নিবারণ হয়ে শুকনা গুঁড়া পাতা খেলে ডায়রিয়া ও মানসিক চাপ কমায়।
উৎপাদন এলাকা: নরসিংদী, গাজীপুর, নেত্রকোনা ও সিলেট এলাকায় লটকন চাষ বেশি হয়।
ব্যবহার: মাঝারি আকারের চিরসবুজ বৃক্ষ। ফল গোলাকার ক্যাপসুল পাকলে হলুদ বর্ণের হয়। ফলের খোসা ছড়ালে ৩/৪টি বীজ পাওয়া যায়। ফল হিসেবেই ব্যাপকভাবে ব্যবহার হয়।

[৯২] *সূরা আল ইনশিরাহ আয়াত: ৮*

[৯৩] *জামে' আস সাগীর হা: ১২০৫*

শুব্বান পাতা

صفحة الشبان

নবুওত ও আমাদের কর্তব্য

মূল: আব্দুল মুহসিন আল-আব্বাদ আল-বদর
সংক্ষিপ্ত অনুবাদ: **সাব্বির রায়হান বিন আহসান হাবিব**★

নবুওয়তের চরম প্রয়োজনীয়তার সেকাল: এই উম্মতের মাঝে মুহাম্মাদুর রাসূলল্লাহ ﷺ-এর নবুওত হলো সবচেয়ে বড়ো নিয়ামত। এই বিশাল নিয়ামতের কারণে উম্মত আল্লাহর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের প্রতি চরম মুখাপেক্ষী। তার আগমনের উদ্দেশ্য ছিল মানুষকে চলমান ও ভবিষ্যত সময়ের কল্যাণ সম্পর্কে অবহিতকরণ এবং সর্বযুগের অকল্যাণ সম্পর্কে সতর্কীকরণ। তার আগমন এমন সময়ে ঘটেছিল যখন কোনো রাসূল বর্তমান ছিলেন না। সে সময় যাবতীয় আসমানী কিতাব ছিল নিশ্চিহ্নপ্রায়। ভ্রষ্টতা ও অজ্ঞতায় ছেয়ে গিয়েছিল গোটা বিশ্ব।

বিশ্বাস, সংস্কৃতি, চারিত্রিক দিক থেকে মানুষের অবস্থা হয়েছিল শোচনীয়। এহেন দুরাবস্থা থেকে তিনি ﷺ মানব জাতিকে ইলম ও হিদায়াতের সুবিশাল অট্টালিকার দিশা দেন। মানব-অন্তরগুলোকে এমন দিকনির্দেশনা দেন যাতে সেখানে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো স্থান না থাকে।

রাসূল ﷺ-এর নবুওত নিয়ে মুশরিকদের আপত্তি:

সীরাতে মুস্তাকীমের পথ দেখানোর জন্য যখন রাসূল ﷺ নবুওতপ্রাপ্ত হন, তখন মুশরিকরা তাদের সাধ্যমতো রাসূল ﷺ-এর সাথে শত্রুতামূলক আচরণ এবং মানুষকে তাঁর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করতে শুরু করে। যাদুকর, গণক, পাগল ইত্যাদি নিকৃষ্ট বিশ্লেষণের মাধ্যমে তারা রাসূল ﷺ-কে অপমান করতে শুরু করে। অথচ রাসূল ﷺ-এর সোনালী অতীত সম্পর্কে অন্যদের চেয়েও মক্কার মুশরিকরা বেশি অবগত ছিল। কিন্তু এরপরও এতকিছুর মূল কারণ হলো হিংসা ও অহঙ্কার। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا﴾

তারা দৃঢ়তার সাথে আল্লাহর শপথ করে বলত যে, তাদের নিকট কোনো সতর্ককারী এলে তারা অন্যসব সম্প্রদায় অপেক্ষা সৎ পথের অধিকতর অনুসারী হবে। কিন্তু তাদের নিকট যখন সতর্ককারী এলেন তখন তারা শুধু তাদের বিমুখতাই বৃদ্ধি করল।[৯৪]

আল্লাহ তা'আলা তাদের এ অপত্তিগুলো খণ্ডন করতঃ সমগ্র বিশ্বকে জানিয়ে দিলেন যে, বিষয়াবলীর সিদ্ধান্ত একমাত্র তাঁরই হাতে। সৃষ্টি তাঁর। এই সৃষ্টির মাঝে তিনি যদি কাউকে সম্মানিত করেন তবে সেটা তাঁরই ইচ্ছাধীন। তিনি তাঁর রিসালাতকে কোথায় পাঠাবেন সে সম্পর্কে তিনিই সম্যক অবগত।[৯৫]

শাইখাইনের শর্ত অনুপাতে, ইমাম হাকিম বর্ণিত হাদীসে এসেছে যে, আবূ জাহল একদিন রাসূল ﷺ কে বলেছিল যে, আমরা তোমাকে মিথ্যারোপ করি না; বরং তুমি যদ্বারা প্রেরিত হয়েছ তার মিথ্যারোপ করি। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করলেন:

﴿فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ﴾

কিন্তু তারা তো তোমাকে অস্বীকার করে না, বরং যালিমরা আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে।[৯৬]

রাসূল ﷺ-এর চরিত্র:

রাসূল ﷺ-এর চারিত্রিক উৎকর্ষতা সম্পর্কে তাঁর কাছের ও দূরের কিছু মানুষের সাক্ষ্য:

১. খাদিজা رضي الله عنها-এর সাক্ষ্য: রাসূল ﷺ হেরা গুহায় প্রথমবারের মতো নবুওতপ্রাপ্ত হওয়ার পর যখন ঘরে

সহকারী উসতায, মাদরাসাতুন নুর, বারিধারা, ঢাকা

[৯৪] *সূরা ফাতির আয়াত: ৪২*
[৯৫] *সূরা আনআম আয়াত: ১২৪*
[৯৬] *সূরা আনআম আয়াত: ৩৩, (আল-ইলালুল কাবীর: ৩৫৪, মুরসাল সহীহ)*

ফিরে খাদিজা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-কে বললেন: "আমি আমার নিজেকে নিয়ে ভয়ে আছি"। তখন খাদিজা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বললেন: "আল্লাহর কসম, কখনও না। আল্লাহ আপনাকে কখনও অপমাণিত করবেন না। আপনি তো আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার করেন, অসহায় দুর্বলের দায়িত্ব বহন করেন, নিঃস্বকে সাহায্য করেন, মেহমানের মেহমানদারী করেন এবং দুর্দশাগ্রস্তকে সাহায্য করেন।"[৯৭]

২. কাবা পুনঃনির্মাণের সময় কুরাইশ কাফেরদের সাক্ষ্য: নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নবুওতের পূর্বে যখন কুরাইশরা কাবা পুনঃনির্মাণের সিদ্ধান্ত নেয় তখন হাজরে আসওয়াদ স্থাপন নিয়ে কুরাইশদের মাঝে মতানৈক্য দেখা দেয়। দীর্ঘ বাদানুবাদের পর তারা এ মর্মে একমত হয় যে, যিনি দরজা দিয়ে সর্বপ্রথম প্রবেশ করবেন আমরা তার সিদ্ধান্ত মেনে নেব। অতঃপর দেখা গেল যে, সর্বপ্রথম প্রবেশকারী হলেন মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। এতে কুরাইশরা সকলেই খুশি হয়ে গেল এবং বলে উঠল, "আল-আমীন এসেছে, মুহাম্মাদ এসেছে"।

৩. রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সততার ব্যাপারে কুরাইশদের স্বীকৃতি প্রদান: নবুওতের প্রাথমিক সময়ে একদিন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাফা পাহাড়ে আরোহণ করে সকলকে সমবেত হওয়ার জন্য আহ্বান করলেন। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সকলকে উদ্দেশ করে বললেন, "বলতো, আমি যদি তোমাদের বলি যে, শত্রু সৈন্য উপত্যকায় এসে পড়েছে, তারা তোমাদের ওপর অতর্কিত আক্রমণ করতে উদ্যত, তোমরা কি আমাকে বিশ্বাস করবে? তারা বলল, হ্যাঁ আমরা আপনাকে সর্বদা সত্য পেয়েছি।"...[৯৮]

৪. আবু জাহলের স্বীকারোক্তি: আবু জাহল একদিন বলেছিল, "আমরা তোমাকে মিথ্যারোপ করি না; বরং তুমি যদ্বারা প্রেরিত হয়েছ তার মিথ্যারোপ করি।"

৫. হিরাক্লিয়াসের দরবারে আবু সুফিয়ানের সাক্ষ্য।

৬. রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর লেনদেন ও সৎ-সাহচর্য সম্পর্কে সায়েব আল-মাখযূমীর সাক্ষ্য: স্বয়ং সায়েব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ একদা আমি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে শুনতে পাই যে,

লোকেরা আমার সম্পর্কে আলোচনা করছে এবং আমার প্রশংসা করছে। তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেনঃ আমি তার সম্পর্কে তোমাদের চাইতে অধিক অবগত। তখন আমি বলিঃ আমার বাপ-মা আপনার জন্য উৎসর্গ হোক! আপনি ঠিকই বলেছেন। আপনি আমার উত্তম সাথী ছিলেন। আপনি আমার সাথে কোনো দিন মারামারি এবং ঝগড়া-ফ্যাসাদ করেননি।[৯৯]৭.

নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সত্যবাদিতা সম্পর্কে আব্দুল্লাহ বিন সালামের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) স্বীকারোক্তি।

৮. মিকরায বিন হাফস বিন আহনাফের সাক্ষ্য।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি উম্মতের কিছু হক হলো: তারা এ মর্মে সাক্ষ্য দিবে যে,

১. রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হলেন সমগ্র জিন ও মানব জাতির জন্য আল্লাহর প্রেরিত রাসূল।

২. তাঁর শরীয়তের কার্যকারিতা কিয়ামত পর্যন্ত বহাল থাকবে।

৩. তাঁর শরীয়ত সার্বজনীন। কেউ এর গণ্ডি থেকে মুক্ত নয়। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন,

«والذي نفس محمد بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي، ولا نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به، إلا كان من أصحاب النار»

সে সত্তার কসম, যার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ, ইহুদি হোক আর খ্রিষ্টান হোক, যে ব্যক্তিই আমার এ আহবান শুনেছে, অথচ আমার রিসালাতের ওপর ঈমান না এনে মৃত্যুবরণ করেছে, অবশ্যই সে জাহান্নামী হবে।[১০০]

৪. তাঁর শরীয়ত স্থান-কালভেদে উপযুক্ত বা যৌক্তিক। তাঁর দেখানো পথে না চললে দুনিয়ায় কোনো সফলতা নেই আর আখিরাতে নেই কোনো নাজাত।

৫. তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হলেন উম্মতের একমাত্র আদর্শ।

[৯৭] *সহীহ বুখারী হা: ৪*
[৯৮] *সহীহ বুখারী হা: ৪৭৭০*
[৯৯] *আবূ দাউদ হা: ৪৭৮১, সহীহ*
[১০০] *সহীহ মুসলিম হা: ১৫৩*

৬. অদৃশ্য, অতীত এবং ভবিষ্যত সম্পর্কে সংবাদ দানে তিনি সত্যবাদী এবং সত্যপ্রাপ্ত।

৭. তার ভালোবাসা দিয়ে এই অন্তর আবাদ করতে হবে; যেই ভালোবাসা স্বয়ং নিজেকে, এমনকি বাবা-মা, সন্তান-সন্ততি ও সমগ্র মানবকুলকে ভালোবাসার চেয়েও বৃহৎ। তার প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শনের অন্যতম মাধ্যম হলো তাঁর শরীয়তকে ভালোবাসা এবং সম্মানের সহিত নিজ জীবনে এর বাস্তবায়ন ঘটানো।

৮. ইবাদত হবে একমাত্র আল্লাহর জন্য এবং একমাত্র সেই পদ্ধতিতে যেই পদ্ধতি আল্লাহর রাসূল ﷺ অঙ্কন করে গিয়েছেন। সুতরাং, তার শরীয়ত ব্যতীত ইবাদত গ্রহণযোগ্য নয়। রাসূল ﷺ বলেন,

من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه، فهو رد.

কেউ আমাদের এ শরী'আতে নেই এমন কিছুর অনুপ্রবেশ ঘটালে তা প্রত্যাখ্যাত।[১০১]

শাইখুল ইসলাম মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব এই বিষয়গুলোকে খুব সংক্ষিপ্তভাবে এক কথায় প্রকাশ করেছেন। মুহাম্মাদ ﷺ-কে রাসূল হিসেবে সাক্ষ্য দেওয়ার উদ্দেশ্য সম্পর্কে শায়খ বলেন:

طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع.

অর্থাৎ, তার আদেশকৃত বিষয়ের আনুগত্য করা, তার দেওয়া সংবাদকে সত্য বলে মেনে নেওয়া, তিনি নিষেধ করেছেন ও সতর্ক করেছেন এমন বিষয় থেকে দূরে থাকা এবং একমাত্র তার শরীয়ত অনুযায়ী ইবাদত-কর্ম করা।

৯. তাঁর প্রশংসায় জিহ্বা সিক্ত রাখা; তবে সেক্ষেত্রে সদা সতর্ক থাকতে হবে, যাতে এমন কিছু না ঘটে যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অসন্তোষের কারণ হতে পারে।

১০. তাঁর সুন্নতের সৌন্দর্য ও প্রয়োজনীয়তাকে মানুষের সামনে তুলে ধরা।

১১. তাঁর উপর দরুদ পাঠ করা। কৃপণ তো সেই ব্যক্তি যার সামনে রাসূলের নাম উচ্চারিত হওয়ার পরও সে তাঁর ওপর দরুদ পাঠ করে না। পক্ষান্তরে, উম্মতের প্রতি রাসূল ﷺ-এর হক হলো - রবের রিসালাতকে তাদের মাঝে যথাযথভাবে পৌঁছে দেওয়া। যার মাঝেই মূলত উম্মতের দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ নিহিত। বিদায় হজ্জের ভাষণে রাসূল ﷺ বলেন,

وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ كِتَابَ اللَّهِ . وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ " . قَالُوا نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ . فَقَالَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ يَرْفَعُهَا إِلَى السَّمَاءِ وَيَنْكُتُهَا إِلَى النَّاسِ " اللَّهُمَّ اشْهَدِ اللَّهُمَّ اشْهَدْ " . ثَلاَثَ مَرَّاتٍ.

আমি তোমাদের মাঝে এমন এক জিনিস রেখে যাচ্ছি, যা দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে থাকলে তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। তা হচ্ছে আল্লাহর কিতাব।" আমার সম্পর্কে তোমরা জিজ্ঞাসিত হলে, তখন তোমরা কী বলবে?" তারা বলল, আমরা সাক্ষ্য দিব যে, আপনি (আল্লাহর বাণী) পৌঁছিয়েছেন, আপনার হক আদায় করেছেন এবং সদুপদেশ দিয়েছেন। তারপর তিনি তর্জনী আকাশের দিকে তুলে লোকদের ইশারা করে বললেন, "ইয়া আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাক, তিনি তিন বার এরূপ বললেন। *সহীহ মুসলিম* ▣▣

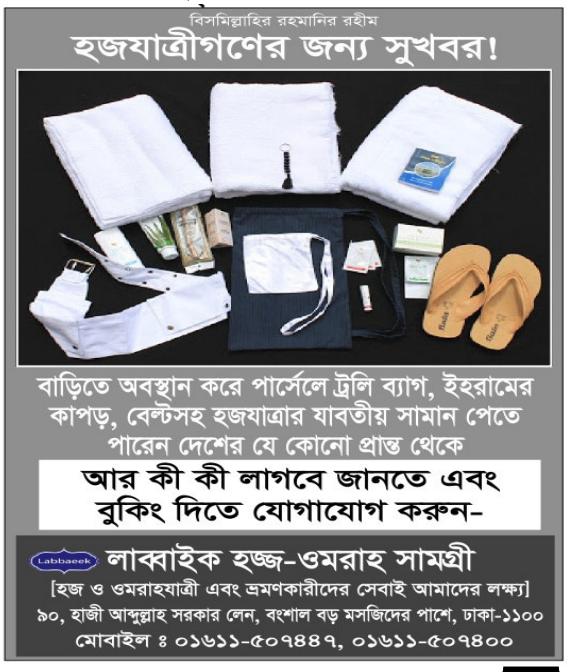

[১০১] *সহীহ বুখারী হা: ২৬৯৭*

ইমামের মর্যাদা

মূল: ড. সুলাইমান বিন সালীমুল্লাহ আর-রুহাইলী*
ভাষান্তর: শাহিদুল ইসলাম বিন সুলতান*

(২য় পর্ব)

তৃতীয় বিষয়: আমানত রক্ষা করা:

ইমাম ও মুয়াজ্জিনের জন্য আমানত রক্ষা করা কর্তব্য। আমানত একটি কঠিন বিষয়। তন্মধ্যে দ্বীন ইসলামের আমানত রক্ষা করা তুলনামূলক সবচেয়ে কঠিন। যাদের ওপর আমানত রাখা হবে তাদেরকে হকদারদের কাছে পৌঁছিয়ে দিতে হবে। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الْإِمَامُ ضَامِنٌ ، وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ، اللَّهُمَّ أَرْشِدِ الْأَئِمَّةَ وَاغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِينَ."

আবূ হুরাইরাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ইমাম হচ্ছেন যিম্মাদার এবং মুয়াজ্জিন (ওয়াক্তের) আমানতদার। হে আল্লাহ! ইমামদের সঠিক পথ প্রদর্শন করুন এবং মুয়াজ্জিনদের ক্ষমা করে দিন।[১০২]

মুয়াজ্জিন আমানতদার-এর অর্থ হল, মুয়াজ্জিনকে অবশ্যই বিশ্বস্ত হতে হবে। মুয়াজ্জিন নির্বাচনের প্রথম শর্ত হল সে বিশ্বস্ত হবে। আমানতদার হিসেবে পরিচিত হতে হবে। এটা প্রথম কথা।

দ্বিতীয়তঃ মানুষেরা তার কাছে দ্বীনের বিষয়ে মহান দায়িত্ব আমানত রেখেছে। তারা তাকে সালাতের দায়িত্ব দিয়েছে যেটা সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। তারা তার কাছে সিয়ামের বিষয়টিও আমানত রেখেছে।

তৃতীয়তঃ এই আমানতের ভার তার ওপর অর্পণ করা হয়েছে। এ সম্পর্কে তাকে মহান আল্লাহর সামনে জিজ্ঞাসা করা হবে। কেননা সে যদি সময়ের পূর্বেই আযান দেয় তাহলে যারা বাড়িতে সালাত আদায় করে তারা সময়ের পূর্বেই সালাত আদায় করে নিবে। এজন্যই প্রথম ওয়াক্তের দিকে খেয়াল রাখা আবশ্যক। তিনি যখন সময়ের পূর্বে মাগরিবের আযান দিবেন (রমাদানের মাসে হোক বা অন্য মাসে হোক, কেননা নিষিদ্ধ সময় ছাড়া পৃথিবীতে মুসলিমগণ সিয়াম পালনে রত থাকেন) তাহলে লোকেরা মাগরিবের পূর্বেই ইফতার করে নিবে। কখনো কখনো সাহারী খেতে আযানের অপেক্ষা করা হয়।

মুয়াজ্জিন যদি ফজরের আযান বিলম্ব করে দেন তাহলে সিয়াম ছুটে যাবে। কখনো সিয়াম রাখা ওয়াজিব হয় যেমন কাযা আদায় ইত্যাদি সিয়াম। এগুলো হল মুয়াজ্জিনের কাঁধে অর্পিত আমানত যার সম্পর্কে আল্লাহর সামনে জিজ্ঞাসা করা হবে।

ইমাম হচ্ছেন যিম্মাদার। এটা এমন বোঝাচ্ছে না যে, ইমাম আমানতদার নন। বরং ইমামও আমানতদার ও আমানতের ভার তারও কাঁধে রয়েছে। মুয়াজ্জিনের দায়বদ্ধতা থেকে ইমামের দায়বদ্ধতা বেশি বোঝানোর জন্য বলা হয়েছে, তিনি জিম্মাদার। কেননা আলেমগণ বলে থাকেন, আমানতদার জিম্মাদার নয় যতক্ষণ না সে অবহেলা করবে। আপনি যদি একজন ব্যক্তির কাছে আপনার সম্পদ গচ্ছিত রাখেন আর সে নগদ অর্থ সংরক্ষণ করার মত সংরক্ষণ করে, অতঃপর সে সম্পদ চুরি হয়ে যায় তাহলে সে জিম্মাদার হবে না। কেননা সে অবহেলা করেনি। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইমামের ক্ষেত্রে বলেছেন, ইমাম জিম্মাদার। সে প্রত্যেক অবস্থায় জিম্মাদার। এটা ইমামের জবাবদিহিতার প্রমাণ করে।

এজন্যই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

﴿اللَّهُمَّ أَرْشِدِ الْأَئِمَّةَ وَاغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِينَ﴾

হে আল্লাহ! ইমামদের সঠিক পথ প্রদর্শন করুন এবং মুয়াজ্জিনদের ক্ষমা করে দিন। যেগুলো অনিচ্ছায় শিথিলতা প্রকাশ পাবে।

* *প্রফেসর, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মদীনা, সৌদি আরব*
* *উস্তায, আল-মা'হাদ আস-সালাফী, নিজখামার, বটিয়াঘাটা, খুলনা।*

[১০২] *আবূ দাউদ হা:*

চতুর্থ বিষয়: জ্ঞানার্জন:

ইমাম ও মুয়াজ্জিনকে জ্ঞানার্জনে গুরুত্বারোপ করা কর্তব্য। আমলের সাথে সম্পৃক্ত বিষয়ে জ্ঞানার্জন করা ফরযে আইন। নবী ﷺ বলেছেন,

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ.

প্রত্যেক মুসলিমের ওপর জ্ঞানার্জন করা ফরয।[১০৩]

ফরয জ্ঞানার্জনের অন্তর্গত হল, যখন কোনো মানুষকে শরয়ী জ্ঞানের জন্য নিযুক্ত করা হবে তখন তার ওপর সংশ্লিষ্ঠ বিষয়ে খুঁটিনাটি জানাও ফরযে আইন। সুতরাং একজন মুয়াজ্জিনের ওপর আযানের বিধিবিধান জানা ও ইমামের ওপর ইমামতির বিধিবিধান জানা আবশ্যক। ইমাম কখনো মুয়াজ্জিনকে সালাতের মাঝে তার স্থলাভিষিক্ত করে থাকেন। সুতরাং যখন সে সালাতের বিধিবিধান সম্পর্কে অবহিত হবে না তখন সে নিজেও মানুষকে সমস্যার মধ্যে ফেলে দিবে। তাই তার জন্য ইমামতি ও সালাতের বিধান জানা ফরযে আইন। যদি সে অবহেলা করে তাহলে পাপী হবে। সুতরাং আমল সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গভীর জ্ঞানার্জনে আগ্রহ দেখানো উচিত।

পঞ্চম বিষয়: উত্তম আদর্শ:

ইমামকে একথা জানা উচিত যে, তিনি একজন আদর্শ। সকল মানুষ ও জনসাধারণ তার থেকে শিখবে। যদি তিনি কোনো কথা নাও বলেন সালাতে দেখে দেখে শিখবে। কিছু মানুষ ইমামের মুখ থেকে শুনে সূরা মুখস্থ করে। এজন্য ইমামকে বিশুদ্ধভাবে তিলাওয়াত ও তাজবীদ বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা উচিত। যদিও তিনি কুরআনের হাফেয হন তবুও প্রত্যেক সালাতে তিনি যা পড়তে চান তা আগেই তিলাওয়াত করা উচিত। কেননা কুরআন পাঠ না করা হলে হারিয়ে যায়। দায়িত্ববোধ আরো বড় কথা।

ইমামের উপর উচিত হল, জেহরি সালাতে যা পড়বে তা আগে তিলাওয়াত করা, ভালোভাবে তিলাওয়াত ও তাজবীদের বিধিবিধান শিখতে আগ্রহ দেখানো। কেননা মানুষ তার থেকে শিখবে।

যেমনভাবে সুন্নাহ অনুযায়ী আমল করতে আগ্রহ দেখানো হয়। হে ইমাম! আপনি কিয়ামতের দিনে অজস্র নেকী নিয়ে হাজির হবেন যা হিসেব করে শেষ করা যাবে না। কারণ মানুষগণ সালাতে আপনার থেকে একটি সুন্নাহ বা কাজ শিখেছে (আর সে আমল করলে আপনিও তার ভাগীদার হবেন)। নবী ﷺ খুতবার সময় যখন সাদকা প্রদানের প্রতি উৎসাহ দিলেন তখন আনসারী একজন লোক দাঁড়িয়ে বাড়িতে চলে গেলেন। বহন করতে অক্ষম এমন একটি বোচকা নিয়ে

এসে রাসূল ﷺ-এর সামনে রেখে দিলেন। মানুষজন দেখে সবাই তার মত দান করতে শুরু করল। তখন রাসূল ﷺ বললেন,

" مَنْ سَنَّ فِي الإِسْلاَمِ سُنَّةً حَسَنَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَلاَ يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَىْءٌ وَمَنْ سَنَّ فِي الإِسْلاَمِ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كُتِبَ عَلَيْهِ مِثْلُ وِزْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَلاَ يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَىْءٌ " .

যে লোক ইসলামে কোন সুন্নাত চালু করলো এবং পরবর্তীকালে সে অনুসারে আমাল করা হলো তাহলে আমালকারীর প্রতিদানের সমান প্রতিদান তার জন্য লিখিত হবে। এতে তাদের প্রতিদানে কোন ঘাটতি হবে না, আর যে লোক ইসলামে কোন অশুভ নীতি চালু করলো এবং তারপর সে অনুযায়ী আমাল করা হলো তাহলে ঐ আমালকারীর খারাপ প্রতিদানের সমান গুনাহ তার জন্য লিখিত হবে। এতে তাদের পাপ সামান্য ঘাটতি হবে না।[১০৪]

চিন্তা করুন -আল্লাহ আপনাদের হিফাযত করুন- হাদীসে একটি শব্দও বলা হয়নি। মূলত তিনি একটি কাজ করেছেন মাত্র। বাড়ি গিয়ে এক বোচকা নিয়ে এসেছেন যা মানুষদের সাদকা করতে উদ্বুদ্ধ করার কারণ। হে ইমাম! আপনি যখন সুন্নাহর প্রতি আগ্রহী হবেন ও মানুষেরা আপনার থেকে সালাতের

[১০৩] *সুনান ইবনে মাজাহ হা:*

[১০৪] *সহীহ মুসলিম হা:*

নিয়মগুলো জানবে। কখনো মসজিদের পাশ দিয়ে অতিক্রমকারী পথিকও দেখে আপনার থেকে শিখবে যে ব্যক্তিকে আপনি চেনেন না। কিন্তু কিয়ামতের দিন আপনি তার আমলনামা নিয়ে হাজির হবেন। এর বিপরীতটাও অনুরূপ। যদি কোনো ব্যক্তি আপনার থেকে শরীয়তবিরোধী বিষয় শিখে তাহলে তার পাপের ভাগীদার আপনিও হবেন।

ষষ্ঠ বিষয়: উত্তম চরিত্র:

ইমামকে উত্তম চরিত্রের অধিকারী হতে হবে। তিনি মসজিদ ও মুসল্লিদের গুরুত্ব দিবেন, তাদের কাছে বিনয়ী হবেন। কেননা হাদীসে তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, তাদের সালাত কণ্ঠনালি পর্যন্ত পৌঁছবে না।

নবী ﷺ বলেছেন, 'যারা কোনো কওমের ইমামতি করে অথচ কওম তাকে অপছন্দ করে।, এই অংশটুকু সহীহ হিসেবে হাদীসে সাব্যস্ত আছে।

আলেমগণ বলেন, শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে অপছন্দনীয় হতে হবে যেমন- অসৎ চরিত্র, ভালোভাবে সলাত আদায় না করা ইত্যাদি। কিন্তু তারা যদি সুন্নাহ পালন করার জন্য অথবা কল্যাণের কাজ করার জন্য অপছন্দ করে তাহলে ইমামের কোনো ক্ষতি হবে না। মূলত তাদেরই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

সপ্তম বিষয়: মুসল্লিদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা:

মুক্তাদীদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা ও বিচক্ষণ হওয়া ইমামের উপর কর্তব্য। নবী ﷺ সালাতে প্রবেশের পর সালাত দীর্ঘ করার ইচ্ছা করতেন। অতঃপর শিশু কাঁদার শব্দ শুনে সালাত হালকা করতেন। কারণ এজন্য মায়ের ওপর কষ্ট হবে। নবী ﷺ বলেছেন,

مَنْ أَمَّ قَوْمًا فَلْيُخَفِّفْ، فَإِنَّ فِيهِمُ الْكَبِيرَ، وَإِنَّ فِيهِمُ الْمَرِيضَ، وَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ، وَإِنَّ فِيهِمْ ذَا الْحَاجَةِ. وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ وَحْدَهُ فَلْيُصَلِّ كَيْفَ شَاءَ."

যে ব্যক্তি কোনো সম্প্রদায়ের ইমামতি করে সে যেন সলাত সংক্ষিপ্ত করে। কেননা তাদের মধ্যে বৃদ্ধ, অসুস্থ, দুর্বল এবং বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত লোক রয়েছে। তোমাদের কেউ যখন একাকি সলাত আদায় করবে, সে তখন নিজ ইচ্ছামত সলাত আদায় করতে পারে।[১০৫]

অষ্টম বিষয়: মসজিদকে গুরুত্ব দেওয়া:

মসজিদকে গুরুত্ব দেওয়া ইমাম ও মুয়াজ্জিনের মর্যাদার সাথে সম্পৃক্ত। মসজিদের দৃশ্যমান জিনিসগুলো পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা। উভয়ের ওপর মসজিদকে পরিচ্ছন্ন রাখতে গুরুত্বারোপ করা উচিত। এটা কল্যাণের কাজ ও সালাফদের নীতি। বর্ণিত আছে যে, আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু মসজিদে নববীতে প্রত্যেক জুম'আর দিন সুগন্ধি দিতেন। অর্থাৎ মসজিদকে সুগন্ধময় করার জন্য ধূপ দিতেন।

আরো বর্ণিত আছে, নবী ﷺ মসজিদের কিবলায় কফ দেখতে পেয়ে তার মুখখানা রক্তবর্ণ ধারণ করল। তখন আনসারী একজন মহিলা এসে পরিষ্কার করেন, ঐ স্থানে সুগন্ধি লাগিয়ে দেন। রাসূল ﷺ তার এ কাজ দেখে বললেন, এটা কতই না চমৎকার!

সুতরাং মসজিদ পরিষ্কার করা মর্যাদা ও সওয়াবের কাজ। আল্লাহর শপথ! এতে ইমামের সম্মান কমবে না, বরং বাড়বে। মুয়াজ্জিনের সম্মান কমবে না, বরং বাড়বে।

আরো অভ্যন্তরীণ গুরুত্ব দেওয়া:

যেমন- বিরক্ত ও সীমালঙ্ঘন না করে মসজিদে পাঠদান করা, উপকারী ভালো কথা ইত্যাদি বলা। কতক ইমাম বাস্তবে মসজিদে মৃতপ্রায়। কখনো বছরে মানুষকে শেখানোর জন্য একটি শব্দও উচ্চারণ করে না। তবে মুক্তাদিদের সাথে ঝগড়া বিবাদের সময় থেমে থাকে না। এটাই ঘাটতি।

কোনো মানুষকে যখন কোনো দায়িত্ব দেওয়া হয় তখন তার ওপর ওয়াজিব হয়ে যায়। যখন কোনো আলোচনা করতে বলা হয় তখন তা তার ওপর ওয়াজিব হয়ে যায়। যদি তাকে শরীয়তের সাথে সাংঘর্ষিক নয় এমন বই সকলকে পড়ে শুনাতে বলা হয় তখন তা পড়ে শোনানো ওয়াজিব হয়ে যায়। (চলবে ইনশা আল্লাহ)

---

[১০৫] *সহীহ মুসলিম হা:*

আত্মহত্যা প্রতিকারে ইসলাম

এ.এস.এম.মাহবুবুর রহমান *

বর্তমানে আত্মহত্যা মারাত্মক ব্যাধি হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিছুদিন আগেও আত্মহত্যা মামুলি বিষয় ছিল না, কিন্তু এখন এতটাই মামুলি বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, কোন সমস্যা বা দুশ্চিন্তার সম্মুখীন হলেই নিজেকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে বা আত্মহননের পথ বেছে নিচ্ছে। বিভিন্ন মিডিয়ায় প্রতিনিয়ত খবর দেখে মনে হয় এই প্রজন্মের কাছে আত্মহত্যা ট্রেন্ডিং হয়ে দাঁড়িয়েছে। শুধু তাই নয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরাও এ পথ বেছে নিচ্ছে। এহেন পরিস্থিতিতে আত্মহত্যার ব্যাপারে সচেতন করতে না পারলে এই সামাজিক মহাব্যাধি মারাত্মক আকার ধারণ করবে। তাই আত্মহত্যা নিয়ে লিখার ইচ্ছা পোষণ করেছি।

আত্মহত্যা হচ্ছে কোনো ব্যক্তি কর্তৃক ইচ্ছাকৃতভাবে নিজের জীবন বিসর্জন দেয়া বা স্বেচ্ছায় নিজের প্রাণনাশের প্রক্রিয়াবিশেষ। ল্যাটিন ভাষায় সুই সেই ডেয়ার থেকে আত্মহত্যা শব্দটি এসেছে, যার অর্থ হচ্ছে নিজেকে হত্যা করা। যখন কেউ আত্মহত্যা করেন, তখন জনগণ এ প্রক্রিয়াকে আত্মহত্যা করেছে বলে প্রচার করে।

বিশ্ব সংস্থা-এর মতে সারা বিশ্বে যেসব কারণে মানুষের মৃত্যু ঘটে তার মধ্যে আত্মহত্যা ত্রয়োদশ প্রধান কারণ। তবে ১৯ বছর থেকে ২৫/৩০ বছর বয়সী যুবক-যুবতীরা বেশি আত্মহত্যা করে। সবচেয়ে বেশি আত্মহত্যার দিক দিয়ে বাংলাদেশের অবস্থান ১৩তম এবং দক্ষিণ এশিয়ায় দশম। আর পুরুষদের আত্মহত্যা করার প্রবণতা নারীদের তুলনায় তিন থেকে চারগুণ বেশি। বিবিএসের জরিপ বলছে, বাংলাদেশে বছরে আত্মহত্যা করে প্রায় ১৩ হাজার মানুষ। গড়ে প্রতিদিন মারা যায় প্রায় ৩০ জন।

বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত তথ্যের ভিত্তিতে জানা যায়, গত বছর বাংলাদেশে ১০১ জন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী আত্মহত্যা করেছে। তন্মধ্যে ৬৫ জন ছেলে শিক্ষার্থী, ৩৬ জন মেয়ে। জরিপ অনুযায়ী বলা যায়, যারা আত্মহত্যা করেছে তাদের মধ্যে ৬২ জন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী যা মোট আত্মহত্যাকারী শিক্ষার্থীর ৬১.৩৯ ভাগ। আর বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩ জন যা মোট শিক্ষার্থীর ২২.৭৭ শতাংশ।

বাকিরা মেডিকেল কলেজ, প্রকৌশল বিশবিদালয়সহ অন্যান্য উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী। এইতো শুধু মে মাসেই ঢাবি, রাবি, জাবি ইবিসহ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে আত্মহত্যা করেছে ৬ জন। আঁচল ফাউন্ডেশনের গবেষণা অনুযায়ী ২০২০ সালে আত্মহত্যা করেছে ৭৯ জন।

গবেষণায় আরো জানা যায় যে, ডিপ্রেশন, সম্পর্কের অবনতি, পারিবারিক সমস্যা, অর্থনৈতিক সমস্যা, বেকারত্ব, দারিদ্র, ধর্মীয় শিক্ষার অভাব ইত্যাদিই আত্মহত্যার প্রধান কারণ।

আল্লাহর প্রতি শিরক স্থাপনের পর সবচেয়ে গুরুতর অপরাধ হলো আত্মহত্যা করা এবং ইমাম জাহাবী আত্মহত্যাকে ৭০টি বড় পাপের মধ্যে ২৯ নাম্বারে রেখেছেন। আল্লাহ তা'আলা বান্দার ওপর আত্মহত্যাকে হারাম করেছেন এবং পবিত্র কোরআনে আত্মহত্যাকারীর জন্য পরকালে কঠোর আজাবের ঘোষণা দিয়ে বলেছেন, 'তোমরা নিজেদের হত্যা করো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু। আর যে ব্যক্তি সীমা লঙ্ঘন করে আত্মহত্যা করবে তাকে অগ্নিতে দগ্ধ করব। এটা আল্লাহর পক্ষে সহজ।[১০৬]

আত্মহত্যাকারীর জন্য হাদিসে কঠোর শাস্তির কথা এবং ভয়ানক পরিণতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

জুনদুব বিন আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি জখম হয়ে (অধৈর্য হয়ে) আত্মহত্যা করে। এরই প্রেক্ষিতে আল্লাহ বলেন, 'আমার বান্দা আমার নির্ধারিত সময়ের আগেই নিজের জীবনের ব্যাপারে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। আমি তার ওপর জান্নাত হারাম করে দিলাম।[১০৭]

* ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়া দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

[১০৬] সূরা আন নিসা আয়াত: ২৯-৩০
[১০৭] সহীহ বুখারী হা: ১৩৬৪

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'যে ব্যক্তি নিজেকে পাহাড়ের ওপর থেকে নিক্ষেপ করে আত্মহত্যা করে, সে জাহান্নামের মধ্যে সর্বদা ওইভাবে লাফিয়ে পড়ে নিজেকে নিক্ষেপ করতে থাকবে। যে ব্যক্তি বিষপান করে আত্মহত্যা করে, সে-ও জাহান্নামের মধ্যে সর্বদা ওইভাবে নিজ হাতে বিষ পান করতে থাকবে। আর যেকোনো ধারালো অস্ত্র দ্বারা আত্মহত্যা করে, তার কাছে জাহান্নামে সেই ধারালো অস্ত্র থাকবে, যা দ্বারা সে সর্বদা নিজের পেট ফুঁড়তে থাকবে।'[১০৮]

আত্মহত্যা কতটা ঘৃণিত বিষয় হলে রাসূল ﷺ আত্মহত্যাকারীর জানাজার ইমামতি করেননি তবে বাকিদের পড়তে বলেছেন। জাবের বিন সামুরা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, 'রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে এমন এক ব্যক্তিকে নিয়ে আসা হয়েছে, যে লোহার ফলা দ্বারা আত্মহত্যা করেছিল, ফলে তিনি তার জানাজার নামাজ আদায় করেননি।'[১০৯]

মানব জীবনে হতাশা, পরাজয়, দুশ্চিন্তা, তিক্ততা, থাকবেই, এগুলো মানুষের জীবনের সাথে ওৎপ্রোতভাবে জড়িত, সবার জীবনে সেটা কোনো না কোনো সময় এসেই থাকে। কিন্তু সর্বদা লেগে থাকে না। পজিটিভ এবং নেগেটিভ এই দুই চিন্তারই এক বিশাল জায়গা এই ধরনী। তাই পজিটিভ চিন্তাকে সমৃদ্ধ করে, সফল মানুষকে ফোকাস রেখে পজিটিভ চিন্তা নিয়ে এগিয়ে গেলে অনেকদূর যাওয়া সম্ভব। কেননা নখ বড় হলে যেমন আঙুল কেটে ফেলতে নেই ঠিক তেমনিভাবে সমস্যায় পতিত হলে সমাধান করতে হয় তবে নিজেকে শেষ করে নয়।

আত্মহত্যা প্রতিকারে কিছু পয়েন্ট তুলে ধরছি-

ধর্মীয়জ্ঞান থাকতে হবে: প্রতিটি ধর্মের রয়েছে নির্দিষ্ট নীতিমালা ও বিধিনিষেধ। ধর্মের অনুসারী হিসেবে প্রায় সবাই নিজ ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল আর পৃথিবীতে অধিকাংশ ধর্মেই আত্মহত্যা নিষেধ করা হয়েছে ঠিক তেমনিভাবে ইসলামেও আত্মহত্যা হারাম করা হয়েছে।

প্রকৃতভাবে ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলা ব্যক্তি কখনো আত্মহননের পথ বেছে নিতে পারে না। ইতিহাসে এমন একটি ঘটনা খুঁজে পাওয়া যাবে না যেখানে প্রকৃতভাবে ইসলামের অনুশাসন মেনে চলার পরেও আত্মহত্যা করেছে। কারণ তারা জীবনের মানে বুঝেছে, রবের থেকে যা পেয়েছে তাতেই সন্তুষ্ট থেকেছে। ধর্মপ্রাণ পরিবার হলে পরিবারের সদস্যদের জন্য ধর্মীয় বিধিনিষেধ পালন করা সহজ হয়। সন্তানরা ছোট থেকে দ্বীনি পরিবেশে বেড়ে ওঠায় তাদের মধ্যে আনুগত্য, নৈতিকতা ও মূল্যবোধ তৈরি হয়। পাশাপাশি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় ইসলাম ও নৈতিকতাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে শিক্ষার্থীদের মনন গঠন করতে হবে।

ধৈর্য ধারণ করতে হবেঃ ধৈর্য একটি মহৎ গুণ, যার ফলাফল অত্যন্ত সুমিষ্ট হয়। মানব জীবনে ধৈর্যের চেয়ে কল্যাণকর আর কিছু নেই। এই জীবনে যে ধৈর্য ধারণ করতে পেরেছে সেই ব্যক্তিই সফল হয়েছে। আল্লাহ নিজেই বলেছেন, 'আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন'।[১১০]

যে ধৈর্য ধারণ করতে পারে নাই সেই ব্যর্থ হয়েছে। তাই রব্বে কারিমের ফয়সালা মেনে নিয়ে আমাদের ধৈর্য ধারণ করতে হবে তবেই আত্মহত্যা নামক বাজে চিন্তা মাথায় আসবে না।

সর্বাবস্থায় আল্লাহর ওপর ভরসা করা : যে কোনো পরিস্থিতিতে আল্লাহর ওপর পূর্ণ ভরসা করতে হবে। অল্পতেই নিরাশ হওয়া যাবে না, আল্লাহ বলেন: 'তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে নিরাশ হয়ো না।[১১১]

পারিবারিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক নানা সংকট থেকে মানুষ আত্মহত্যায় প্ররোচিত হয়। দুঃখ, কষ্ট, হতাশা, দুর্দশা স্থায়ী হয় না। তাই আত্মহননের পথ বেছে না নিয়ে আল্লাহর ওপর ভরসা রেখে সুখের আশা রাখতে হবে। কেননা আল্লাহ কোরআন মাজিদে এরশাদ করেন, 'কষ্টের সঙ্গেই তো সুখ আছে। নিশ্চয় কষ্টের সঙ্গেই সুখ আছে।'[১১২] আরো বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর ভরসা করে তার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।[১১৩] আল্লাহ পাক অন্যত্র এরশাদ করেন, 'যারা

[১০৮] *সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম*
[১০৯] *সহীহ মুসলিম*
[১১০] *সূরা বাকারা আয়াত: ১৫৩*
[১১১] *সূরা আয্-যুমার আয়াত: ৫৩*
[১১২] *সূরা আল ইনশিরাহ আয়াত: ৫-৬*
[১১৩] *সূরা আত তালাক আয়াত: ৩*

পথভ্রষ্ট তারা ব্যতীত আর কে তার রবের অনুগ্রহ হতে নিরাশ হয়?'।[১১৪] তো দিনশেষে যারা আল্লাহর ওয়াদায় ভরসা রেখে সামনে এগিয়ে যায় সে কোনোভাবেই হতাশ হওয়ার কথা নয়, প্রকৃতপক্ষে যারাই ভরসা পায় না তারাই দিনশেষে আত্মহত্যা করে।

জীবন আপনার, ইচ্ছাও আপনার, নিজেকে শেষ করবেন নাকি অন্য এক ভোরের আলোর অপেক্ষা করবেন?

অপসংস্কৃতি থেকে দূরে থাকা : সমাজে অপসংস্কৃতির কালো থাবা দিন দিন বেড়েই চলছে। এই কালো থাবা যেমন যুব সমাজকে আত্মহত্যাপ্রবণ করে তুলছে ঠিক তেমনিভাব জাতির সুউজ্জ্বল ভবিষ্যৎকে ধংসের জন্য পরিশ্রমহীন ভূমিকা পালন করছে। কিছু বিদেশী চ্যানেলে দেখানো হয় পারিবারিক কলহ, বাবা-মা, ভাই-বোন, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সামান্য মান অভিমানে আত্মহত্যা করা। নগ্নতা, বিবাহবহির্ভূত রিলেশন তো আছেই। সুতরাং নগ্নতা, অশ্লীলতা, অপসংস্কৃতি বন্ধ করে সুস্থ সংস্কৃতি চর্চা করলে তবেই আত্মহত্যা প্রতিকার করা সম্ভব।

আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের মতে, কবিরা গুনাহকারী চিরস্থায়ী জাহান্নামী নয়, আর সকল আলেমদের ঐকমত্যে আত্মহত্যা করা কবিরা গোনাহ। সুতরাং শিরক ছাড়া অন্যসব গোনাহ আল্লাহ চাইলে মাফ করতে পারেন বা তাওবার দ্বারা মাফ হয়। যদিও আত্মহত্যাকারীর জন্য তাওবার সুযোগ নেই। তাওবা করতে না পারলেও আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করলে ঈমানদার হওয়ার কারণে দীর্ঘ শাস্তি ভোগের পর নিজ রহমতে আত্মহত্যাকারীকেও মাফ করে দিতে পারেন। তবে কেউ যদি আত্মহত্যাকে হালাল মনে করে আত্মহত্যা করে তবে সে চিরস্থায়ী জাহান্নামী । আল্লাহ আমাদের রহম করুক, আমিন।

হে প্রিয় ভাই-বোন! লেখনীর ক্লান্তিলগ্নে বলতে চাই, এই জীবন খেল তামাশার বস্তু নয়। নগণ্য কারণে জীবনকে শেষ করার মানে হয় না। কষ্ট, দুর্দশা এবং হতাশা থাকবেই কিন্তু সমাধান খুঁজতে হবে, যদি নিজেকেই শেষ করে দেন তাহলে শেষ চেষ্টার সুযোগ থাকবে না। হয়তো কাউকে হারানোর যন্ত্রণায় নিজেকে হারিয়ে ফেললেন অপরদিকে বাবা-মা আত্মীয় স্বজনের কথা ভাবলেন না। যেই বেকারত্ব, দারিদ্র, রিজিকের কথা ভেবে আত্মহননের পথ বেছে নিচ্ছেন অথচ রব্বে কারিম ৫০ হাজার বছর আগেই সেই রিজিক লিখে রেখেছেন। ধৈর্য ধরুন, আল্লাহর ওপর ভরসা রাখুন, সর্বোচ্চ চেষ্টা চালিয়ে যান আল্লাহ সহায় হবেন ইনশা আল্লাহ।

পরিশেষে আল্লাহ আমাদের আত্মহত্যা নামক কবিরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার তাওফিক দান করুন, আমিন। ▣▣

[১১৪] *সূরা আল হিজর আয়াত: ৫৬*

আমার প্রার্থনা

মোঃ শফিকুল ইসলাম[❋]

দিনের পরে দিন চলে যায়
মাসের পরে মাস,
কালের স্রোতে দেখি আমি
আমার সর্বনাশ।
পাপের বোঝা ভীষণ ভারী
বহন করা দায়,
রোজ কিয়ামত নয় বেশি দূর
বুক ভাসে কান্নায়।
হাতের গুনাহ, পায়ের গুনাহ
ঢের হয়েছে ঢের,
ঘুমিয়ে থাকা বোকা বিবেক
পায়নি কভু টের।
চোখের গুনাহ, কানের গুনাহ
মুখের গুনাহও শত,
চলতে ফিরতে খাইতে নাইতে
হয়েছে শত শত।
সিয়ামের মাসে, কিয়ামের মাসে
হে রহিম, গাফফার,
সকল পাপ পূন্যে ভরে
ক্ষমা করো আমার।

[❋] *সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক,টাংগাইল জেলা শুব্বান।*

ফাতাওয়া ও মাসায়েল | الفتاوى والمسائل

ফাতাওয়া বোর্ড, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

প্রশ্ন (১) ঃ *ঈদুল আযহার কুরবানী করার হুকুম কী? এটা কি সুন্নাত না ওয়াজিব? দয়া করে জানাবেন।*

মাহমুদ গাজী, তিতাস, কুমিল্লা

উত্তর ঃ ঈদুল আযহার কুরবানী করা বিরাট একটি ইবাদত। এটা আল্লাহর নৈকট্য হাসিল করা ও প্রচুর সাওয়াব অর্জন করার অন্যতম উপায়। নবী করীম ﷺ মদীনাতে প্রত্যেক বছরই কুরবানী করতেন। ইবনে উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল ﷺ মদীনাতে দশ বছর অবস্থান করেছেন।[১] আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল ﷺ মদীনাতে শিংবিশিষ্ট দু'টি কালো রং-এর ভেড়া কুরবানী করেছেন।[২] তাই অধিকাংশ আলেমের মতে সামর্থবান ব্যক্তির উপর কুরবানী করা সুন্নাতে মুআক্কাদা। কুরবানী দেওয়ার ক্ষমতা রাখে এমন ব্যক্তির জন্য কুরবানী না দেওয়া দূষণীয়।

ইমাম আবু হানীফা রহিমাহুল্লাহ-এর মতে কুরবানী করা ওয়াজিব। তিনি ব্যতীত অন্য কোনো আলেম কুরবানী করাকে ওয়াজিব বলেননি। কারণ, কুরবানী করা ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে তিনি যে দলীলগুলো উল্লেখ করেছেন তা সহীহ নয়। আর সহীহ হলেও তা কুরবানী করা ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে সুস্পষ্ট নয়। (আল্লাহই ভাল জানেন)

প্রশ্ন (২) ঃ *আমাদের সমাজের নিয়ম হচ্ছে, ঈদের সালাতের পর ঈদগাহ-এর খতীব সাহেব লম্বা ছুরি নিয়ে আসেন এবং সবার কুরবানী যবেহ করেন। খতীব সাহেব আসা পর্যন্ত সবাই অপেক্ষা করেন। কেউ তার নিজের কুরবানী যবেহ করেন না। এমনকি অন্য কোনো আলেম উপস্থিত থাকলেও তাকে দিয়ে কুরবানী যবেহ করানো হয় না। আর একজন লোকের পক্ষে এতগুলো কুরবানী যবেহ করা সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। দেখা যায় চেয়ারম্যান বাড়ি ও ধনী লোকদের বাড়িতে খতীব সাহেব সবার আগে যান। এরপর অন্যান্য বাড়িতে যান। আমাদের বাড়িতে আসতে অনেক বেলা হয়ে যায়। দয়া করে বলবেন, আমরা কি আমাদের কুরবানী নিজে যবেহ করতে পারবো? অন্য কোনো হুজুর দিয়ে যবে করলে কি জায়েয হবে?*

সাদ মুহাম্মাদ, বড় মির্জাপুর, খুলনা

উত্তর ঃ আসলে কুরবানীর পশু নিজ হাতে যবেহ করা সুন্নাত ও উত্তম। নবী ﷺ নিজ হাতে কুরবানীর পশু যবেহ করতেন।[৩] নিজে করতে না পারলে অন্যকে দিয়ে করা যেতে পারে। কুরবানী যবাই করার সময় বিসমিল্লাহির আল্লাহু আকবার বলে যবাই করবে। অতঃপর কুরবানী আল্লাহর দরবারে কবুল হওয়ার দু'আ করবে।

আর আপনি দীর্ঘ প্রশ্নের মাধ্যমে যা উল্লেখ করেছেন, তা সহীহ সুন্নাতের সম্পূর্ণ পরিপন্থি। খতীব সাহেবের উচিত এভাবে মানুষকে অনর্থক কষ্ট না দিয়ে সবাইকে নিজ হাতে কুরবানী যবেহ করতো উৎসাহ দেয়া। উল্লেখ্য যে, এভাবে সমাজের সবার কুরবানী খতীব সাহেবের দ্বারা সম্পন্ন করার মধ্যে কোনো অতিরিক্ত সওয়াব নেই। আর যদি মানুষ এই বিশ্বাসে খতীব সাহেবকে দিয়ে কুরবানী যবেহ করান যে, তার হাতের মধ্যে বরকত আছে, তাহলে শির্ক হয়ে যেতে পারে। পরিশেষে প্রশ্নকারীকে বলবো, আপনি এবার থেকে খতীবের অপেক্ষায় না থেকে নির্দ্বিধায় নিজের কুরবানী নিজেই করবেন।

প্রশ্ন (৩) ঃ *আমি একজন সামর্থ্যবান ব্যক্তি। সামর্থ্যবান হওয়া সত্ত্বেও আমি অনেক বছর কুরবানী করিনি। এতে কি আমার গুনাহ হয়েছে? দয়া করে জানাবেন।*

শাহজাহান সরকার, কাউখালী, রাঙ্গামাটি

উত্তর ঃ পূর্বের এক প্রশ্নের জবাবে আমরা বলেছি যে, সামর্থ্যবান ব্যক্তির ওপর কুরবানী করা সুন্নাত; ওয়াজিব নয়। হানাফী মাযহাবেই কেবল কুরবানী করা ওয়াজিব

[১] *জামে আত-তিরমিযী-আহমাদ*
[২] *সহীহ বুখারী হা: ১৫৫১*
[৩] *সহীহ মুসলিম হা: ১৯৬৬*

হওয়ার ফতোয়া রয়েছে। ইমাম আবু হানীফা (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) ছাড়া আর কোনো ইমাম কুরবানী করা ওয়াজিব বলেননি। তাই আমরা বলবো যে, আপনার জন্য সুন্নাত ও উত্তম ছিল কুরবানী করা। কেননা নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রত্যেক বছরই মদীনাতে কুরবানী করেছেন। কিন্তু তা না করে আপনি উত্তম ও সুন্নাতের বিপরীত করেছেন। আশা করি এখন থেকে প্রতি বছর কুরবানী করবেন। আল্লাহ আপনাকে তওফীক দিন। আমীন।

☞ প্রশ্ন (৪) ঃ ঈদের চাঁদ কিংবা নতুন চাঁদ দেখার বিষয়ে কোনো আমল আছে কি?

জাহাঙ্গীর আলম, বড়াইগ্রাম, নাটোর

উত্তর ঃ ঈদের চাঁদ কিংবা প্রত্যেক মাসের নতুন চাঁদের দু'আ পাঠ করার ব্যাপারে বর্ণিত হাদীসকে কেউ কেউ যঈফ বললেও অনেক আলেম সেটাকে হাসান বলেছেন। নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নতুন চাঁদ দেখে এই দু'আ পাঠ করতেন:

«اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيمَانِ، وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ، رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهُ»

শব্দের কমবেশি করে মুহাদ্দিসগণ এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।[৪]

☞ প্রশ্ন (৫) ঃ *আমি একটি জায়গায় দান করার নিয়ত করেছি। আমি কি এখন নিয়ত পরিবর্তন করে অন্য জায়গায় দান করতে পারবো?*

মানিক মিয়া, মহেশপুর, ঝিনাইদহ

উত্তর ঃ এ ক্ষেত্রে জেনে রাখা আবশ্যক যে, কোনো নফল বা মুস্তাহাব ইবাদতের নিয়ত করলেই তা ওয়াজিব হয়ে যায় না। এমন কি নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে অথবা মাদরাসা কিংবা মসজিদে কিছু দান করার নিয়ত করলেও তা দেওয়া ফরয হয়ে যায় না; তবে নিয়ত অনুযায়ী কাজ করা মুস্তাহাব। তাই আমরা বলবো, কাউকে দেওয়ার নিয়ত করার পর যদি অন্যকে কোথাও দেওয়াটা অধিক উপকারী ও কল্যাণকর হয়, তাহলে নিয়ত পাল্টাতে কোনো অসুবিধা নেই। আরো মনে রাখা দরকার যে, নিয়ত করা আর মানত করা এক নয়। মানত করলে যদি মানতের বিষয় অর্জিত হয়, তাহলে মানত পূরণ করা আবশ্যক। আর নিয়ত অনুযায়ী আমল করা ওয়াজিব। সে হিসেবে আমরা বলবো যে, আপনি যাকে দেওয়ার নিয়ত করেছেন, সে যদি আসলেই আপনার দানের প্রতি মুহতাজ হয়ে থাকে, তাহলে তাকে দেওয়াটাই উত্তম হবে। তাকে দিতেই হবে, না দিলে গুনাহগার হবেন, কুরআন ও সহীহ হাদীসে এমন কোনো দলীল নেই।

☞ প্রশ্ন (৬) ঃ *আমি আত্মীয় স্বজন ও প্রতিবেশীদের সাথে মিলে বহু বছর যাবৎ ভাগে গরু কুরবানী করে আসছি। এখন কিছু কিছু আলেম বলছে, এভাবে কুরবানী দিলে হবে না। আবার কারো কাছে এটাও শুনছি যে, ভাগে কুরবানী দিলে অবশ্যই সাতজন মিলতে হবে। দুইজন বা তিনজন বা সাতের কম লোক ভাগে গরু কুরবানী দিলে তা কবুল হবে না। আবার এটাও শুনতে পাচ্ছি যে, ভাগে কুরবানী দেওয়াটা সফরের সাথে খাস। বিষয়টি নিয়ে আমি বিড়ম্বনায় আছি। দয়া করে জানাবেন তাদের বক্তব্য ঠিক কি না?*

জালাল উদ্দীন, ফুলছড়ি, গাইবান্ধা।

উত্তর ঃ একথা সর্বজন বিধিত যে একাকী কুরবানী দেয়াই উত্তম। তবে উট ও গরুতে শরীক হওয়া নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর একাধিক বিশুদ্ধ হাদীস ও সালাফে সালেহীনের বাণী দ্বারা সুপ্রমাণিত। নিম্নে এ সম্পর্কে নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কতিপয় হাদীস ও সালাফে সালেহীনের বাণী পেশ করা হলঃ

(১) ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমরা আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে এক সফরে ছিলাম। এমতাবস্থায় কুরবানীর ঈদ উপস্থিত হল। তখন আমরা গরুতে সাত জন ও উটে দশজন করে শরীক হলাম।[৫]

(২) জাবির বিন আব্দুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে উমরা দ্বারা উপকৃত হতাম। তখন আমরা একটি গরু সাত জনের পক্ষ থেকে যবেহ করতাম, এভাবে আমরা তাতে শরীক হতাম।[৬]

[৪] *সুনান দারেমী হা: ১৭৩০, তিরমিযী হা: ৩৪৫১, আহমাদ হা: ১৩৯৭, সিলসিলা সহীহাহ হা: ১৮১৬*

[৫] *জামে আত-তিরমিযী হা: ১৫০১*

[৬] *সহীহ মুসলিম হা: ১৩১৮*

(৩) জাবের বিন আব্দুল্লাহ হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমরা হুদায়বিয়ার সনে উট সাতজনের পক্ষ থেকে এবং গরুও সাত জনের পক্ষ থেকে কুরবানীক রেছিলাম।[৭]

উপরোক্ত হাদীসগুলোকে দলীল হিসাবে উল্লেখ করে কেউ কেউ বলে থাকেন যে, কুরবানীতে শরীক হওয়া সফরের সাথে খাস। কারণ ওপরের হাদীসগুলোতে সফরের কথা এসেছে।

আলেমগণের মতে উক্ত বর্ণনাগুলোতে সফরের কথা থাকলেও সেখানে একথা আসেনি যে, উক্ত শরীক কুরবানী সফরের সাথেই খাস ও মুকীম অবস্থায় চলবে না। কারণ: (২) মুহাদ্দিসীনে কেরামের অনেকেই উক্ত হাদীসগুলো সাধারণভাবে কুরবানীর অধ্যায়ে এনেছেন। কিন্তু তাঁরা বিষয়টিকে সফরের সাথে খাস করেননি। এ থেকেও বুঝা যায় যে, তারা ঐসব হাদীসকে এমনি সফর বা হজ্জের সফরের সাথে খাস হওয়া মনে করেননি। (২) হাদীসের ব্যাখ্যাকারগণও এসব হাদীসকে সফরের সাথে খাস করেননি। আল্লামা আযীমাবাদী, শাইখ আব্দুর রহমান মুবারকপুরী, শাইখ ওবায়দুল্লাহ রহমানী তাঁরা কেউ-ই উক্ত কুরবানীতে শরীক সম্পর্কিত হাদীসগুলোকে সফরের সাথে খাস করেননি।

(৩) সফরের সাথে শরীক কুরবানীকে তা সফরে সংগঠিত হওয়ার জন্য তার সাথেই খাস করলে যতকিছু নবী ﷺ ও সাহাবায়ে কেরাম কর্তৃক সফরে ঘটেছে তার সবগুলোকেই ঐ সফরের সাথে খাস করা দরকার। আর এ অবস্থায় শরীআতের বহু মাসায়েল আমল থেকে বাদ পড়ে যাবে।

(৪) কুরবানীতে শরীক হওয়া যে সফরের সাথে খাস নয়, তার প্রমাণে আরো একাধিক হাদীস ও সাহাবীদের উক্তি রয়েছে। আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেছেন, কুরবানীর ক্ষেত্রে একটি গরু সাত জনের পক্ষ থেকে এবং একটি উট সাত জনের পক্ষ থেকে যথেষ্ট।[৮] অত্র হাদীসটি নবীর কওলী (বাচনিক) হাদীস যেখানে তিনি সফরের কথা মোটেই উল্লেখ না করে ব্যাপকভাবে বলেছেন, কুরবানীর ক্ষেত্রে গরুতে সাত জনের পক্ষ থেকে এবং উটে সাত জনের পক্ষ থেকে যথেষ্ট। (৫) শাবী হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ সাতজনের পক্ষ থেকে উট এবং সাতজনের পক্ষ থেকে গরু কুরবানী দেয়া মাসনুন হওয়ার বিষয়টি সাহাবীদের থেকে বর্ণিত হয়েছে।[৯]

ইমাম নববী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, একটি কুরবানীর গরুতে অথবা উটে সাত পরিবারের সাতজন কিংবা একই পরিবারের সাতজনের অংশগ্রহণ করা বৈধ। যদিও সাতজনের মধ্যে কারো ইচ্ছা কুরবানী না হয়; বরং শুধু গোশত খাওয়ার ইচ্ছা হয়। বাকিদের অংশ কুরবানী হিসেবে বৈধ হবে। এটা মানতের কুরবানী হোক অথবা মুস্তাহাব (ঈদের) কুরবানী হোক। এটাই ইমাম শাফিঈ, আহমাদ এবং অধিকাংশ আলেমের মত। এক্ষেত্রে গোশতওয়ালার নিয়ত বাকি অংশীদারদের নিয়তের ওপর প্রভাবহীন।[১০]

ভাগে কোরবানী দেয়ার ব্যাপারে সৌদি আরবের ফাতাওয়া বিভাগের স্থায়ী কমিটিকে জিজ্ঞাসা করা হলে কমিটির সদস্যগণ এই জবাব প্রদান করেছেন:

কোরবানীতে একটি গরু বা একটি উট সাতজনের পক্ষ হতে যথেষ্ট। এই সাতজন লোক একই পরিবারভুক্ত হোক অথবা আলাদা আলাদা সাত পরিবারের লোক হোক। চাই এই সদস্যদের মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকুক আর নাই থাকুক। কেননা নবী ﷺ সাহাবীদের একাধিক লোক মিলে উট বা গরু কোরবানী দেয়ার অনুমতি দিয়েছেন। তাদের মাঝে আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকতে হবে কি না এমন কোনো কথা বলেননি। লাজনায়ে দায়িমার কথা এখানেই শেষ।

ইসলাম ওয়েবের প্রশ্নোত্তর বিভাগে এই প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, সাতজনের কম লোক মিলে গরু কোরবানী দিতে পারবে কি না? জবাবে বলা হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ। একটি গরুতে সাতজনের অংশগ্রহণ করা জায়েয আছে।[১১] সাতজনের অংশগ্রহণ জায়েয

[৭] *সহীহ মুসলিম হা: ১৩১৮*
[৮] *সহীহুল জামে আসসগীর হা: ২৮৯০*
[৯] *মুসনাদ আহমাদ, ইমাম হায়সামী বলেনঃ হাদীসটির রিজাল তথা রাবীগণ সহীহ (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম) গ্রন্থের রাবী। (মাজমাউয যাওয়ায়েদ (৩/২২৬)*
[১০] *বিস্তারিত দেখুন আল-মাজমু, ৮/৩৭২*
[১১] *দেখুন প্রশ্ন নং- ৪৫৭৫৭*

হলে সাতজনের কমের অংশগ্রহণ আরো উত্তমভাবেই জায়েয হবে। তিরমিযীর ভাষ্যকার আল্লামা আব্দুর রাহমান মোবারপুরী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, আমি বলছি, হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে যে, রাসূল ﷺ-এর যামানায় সাহাবীগণ উট ও গরুতে অংশগ্রহণ করতেন। এমনিভাবে সাব্যস্ত হয়েছে যে, তারা একটি ছাগলেও অংশগ্রহণ করতেন। তবে ছাগলে অংশগ্রহণের বিষয়টি একই পরিবারের সাত সদস্যের মধ্যে সীমিত। আর গরুতে সাত পরিবারের সাতজনের অংশগ্রহণ জায়েয।[১২]

☞ প্রশ্ন (৭ঃ ***কুরবানীর গোশত কতদিন পর্যন্ত রেখে খাওয়া যাবে? কুরবানীর গোশত কি তিনভাগে ভাগ করা জরুরি? দয়া করে জানাবেন।***

হাবিবুর বাশার, মোহনগঞ্জ, নেত্রকোণা

উত্তর ঃ কোনো এক বছর মদীনাতে অভাব থাকার কারণে এবং কুরবানী কম হওয়ার কারণে নবী করীম ﷺ তিন দিনের বেশি কুরবানীর গোশত জমা করে রাখতে নিষেধ করেছিলেন। পরবর্তীতে যখন অভাব দূর হয়ে গেলো এবং মদীনার অবস্থার উন্নতি হলো, তখন এ নিষেধাজ্ঞা রহিত হয়ে যায়। সালামা বিন আকওয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হয়েছে, নবী ﷺ বলেছেন,

«مَنْ ضَحَّى مِنْكُمْ فَلاَ يُصْبِحَنَّ بَعْدَ ثَالِثَةٍ وَبَقِيَ فِي بَيْتِهِ مِنْهُ شَيْءٌ» فَلَمَّا كَانَ العَامُ المُقْبِلُ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، نَفْعَلُ كَمَا فَعَلْنَا عَامَ المَاضِي؟ قَالَ: «كُلُوا وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا، فَإِنَّ ذَلِكَ العَامَ كَانَ بِالنَّاسِ جَهْدٌ، فَأَرَدْتُ أَنْ تُعِينُوا فِيهَا»

"তোমাদের যারা কুরবানী করেছো, তারা যেন বাড়িতে তিনদিনের বেশি কোনো গোশত না রাখে। পরের বছর সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা কি কুরবানীর গোশত গত বছরের ন্যায় তিনদিন খাবো? অবশিষ্ট অংশ দান করে দিবো? তিনি বললেন, তোমরা তা খাও, অন্যকে খেতে দাও এবং জমা করে রাখো। গত বছর মানুষের অভাবের কারণে আমি তোমাদেরকে কুরবানীর গোশত দিয়ে লোকদেরকে সহযোগিতা করতে বলেছিলাম।[১৩] অতএব এই হাদীসের আলোকে আমরা বলতে পারি যে, কুরবানীর গোশত যতদিন ইচ্ছা রেখে খাওয়া যাবে।

আর কুরবানীর গোশত তিনভাগে ভাগ করাকে আলেমগণ মুস্তাহাব বলেছেন; তবে তা ওয়াজিব নয়। মোট কথা, কুরবানীর গোশত নিজ পরিবার-পরিজনকে খাওয়াবে, আত্মীয়-স্বজনকে খাওয়াবে এবং ফকীর-মিসকীনদের মাঝে বিতরণ করবে। (আল্লাহই সর্বাধিক অবগত)।

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তী

বিগত ২১ জুন-২০২২ অনুষ্ঠিত তা'লীমী বোর্ড-এর সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে বোর্ড অফিসের জন্য **একজন অফিস সহায়ক আবশ্যক**।

প্রার্থীকে আগামী ২১ জুলাই'২২-এর মধ্যে নিম্ন ঠিকানায় আবেদন করতে বলা হচ্ছে।

যোগ্যতা : আলিম/সানাবিয়া (প্রার্থীকে অবশ্যই কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ'র অনুসারী হতে হবে)

বেতন : আলোচনা সাপেক্ষে

দরখাস্ত প্রেরণের ঠিকানা

চেয়ারম্যান– আহলে হাদীস তা'লীমী বোর্ড

কেন্দ্রীয় কার্যালয় : জমঈয়ত ভবন, ৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা-১২০৪।

ফোন নম্বর: ০২-২২৩৩৪৫৩৯৯,

মোবাইল নম্বর: ০১৯৩৩-৩৫৫৯০৯

[১২] *তুহফাতুল আহওয়াযী, (৪/১৫৯)*

[১৩] *সহীহ বুখারী হা: ৫৫৬৯*

পবিত্র ঈদুল আযহা

১৪৪৩ হিজরী, ২০২২ ঈসায়ী, ১৪২৯ বাংলা

আমাদের আহ্বান

প্রিয় মুসলিম ভাই ও ভগ্নিগণ! *আসসালামু 'আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ॥*

আত্মত্যাগ ও আত্মসমর্পণের প্রশিক্ষণ ও বার্তা নিয়ে ঈদুল আযহা আবারো আমাদের মাঝে সমাগত। ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) কর্তৃক জারিকৃত ও রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সমর্থিত এবং মুসলিম উম্মাহ'র জন্য অনুকরণীয় এই বিধানকে সমুন্নত রাখার উদ্দেশ্যেই সমগ্র মুসলিম জাহান নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে ত্যাগ ও কুরবানীর সবক পুনরায় গ্রহণ করে ১০ যুলহিজ্জা ও পরবর্তী আইয়ামে তাশরীকের দিবসগুলোতে কুরবানী করবে ইনশা-আল্লাহ। কুরবানী সুমহান প্রভুর নৈকট্য লাভের অন্যতম প্রধান মাধ্যম। আসুন! আমরা আমাদের রবের নৈকট্য লাভের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে জান্নাতের পথকে কুসুমাস্তীর্ণ করি। আল্লাহ তা'আলা আমাদের কুরবানী ক্ববূল করুন- আমীন।

প্রিয় মুসলিম ভ্রাতৃমণ্ডলী!

এ দেশের আহলে হাদীস তথা কুরআন ও সহীহ হাদীসের একনিষ্ঠ অনুসারীদের মূল তাওহীদী সংগঠন ***বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস****। সহীহ আকীদা ও বিশুদ্ধ মানহাযের উপর সালফে সলেহীনগণের ক্রমধারায় প্রতিষ্ঠিত এ সংগঠনটি বিগত প্রায় আট দশকব্যাপী প্রাতিষ্ঠানিকভাবে কুরআন-সুন্নাহ'র দা'ওয়াহ্ ও তাবলীগের পাশাপাশি আর্তমানবতার সেবায় নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে এবং এ কাজে উত্তরোত্তর গতি সঞ্চারিত হচ্ছে।*

সম্প্রতি ঢাকার অদূরে (বাইপাইল, আশুলিয়ায়) জমঈয়তের নিজস্ব জমিতে প্রতিষ্ঠিত কেন্দ্রীয় ইয়াতীমখানার বহুতল ভবনের দুই তলার কাজ সম্পন্ন হয়েছে আল-হামদুলিল্লাহ। আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল কুরাইশী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) মডেল মাদরাসা'র শিক্ষার মান ও ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় সম্প্রতি একটি নতুন একাডেমিক ভবন নির্মাণ করা হয়েছে এবং আরো একটি ভবন নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। 'ইন্টারন্যাশনাল ইসলামী ইউনিভার্সিটি অব সাইন্স এন্ড টেকনোলজি'র ভবনের কাজও ৯০ শতাংশ সম্পন্ন হয়েছে। যাত্রাবাড়ি-ঢাকায় অবস্থিত বহুতল বিশিষ্ট জমঈয়ত ভবনের ৭ম তলার কাজও চলমান। ৯৮ নবাবপুর রোড, ঢাকায় 'জমঈয়ত টাওয়ার' নির্মাণের কাজ প্রক্রিয়াধীন এবং ভাওরাইদ-গাজীপুরে নওমুসলিম প্রকল্পের ৫ তলাবিশিষ্ট ভবনের অধিবাসীদের কল্যাণে মাননীয় জমঈয়ত উপদেষ্টা আলহাজ্জ এ কে এম. রহমতুল্লাহ এম.পি মহোদয়ের পৃষ্ঠপোষকতা ও সহযোগিত অব্যাহত রয়েছে। এ সংগঠনের মুখপত্র 'সাপ্তাহিক আরাফাত' ও 'মাসিক তর্জুমানুল হাদীস' সমৃদ্ধ কলেবরে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে এবং জমঈয়ত পরিচালিত 'বাংলাদেশ আহলে হাদীস তা'লীমী বোর্ড ঢাকা'-এর কার্যক্রমেও গতি সঞ্চারিত হয়েছে।

এ সকল বহুমুখী কার্যক্রম ফলপ্রসূ হচ্ছে প্রথমত: আল্লাহ তা'আলার মেহেরবানী, অতঃপর আপনাদের আন্তরিক সহযোগিতায়। আর তা অব্যাহত রাখতে এবারও আপনারা এগিয়ে আসবেন, সম্প্রসারিত করবেন আপনাদের দানের হাত– এটাই আমাদের প্রত্যাশা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদের সৎ 'আমলসমূহ কবূল করুন এবং বিশ্বব্যাপী প্রাণঘাতি মহামারী করোনা ভাইরাস ও ভয়াবহ বন্যা থেকে আমাদের হিফাযত করুন –আমীন।

আপনার আর্থিক সহযোগিতা প্রেরণ করুন-

"বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস" সঞ্চয়ী হিসাব নং- ২০৫০১১৮০২০০২৮৫৬০০ ইসলামী ব্যাংক, নবাবপুর রোড শাখা।	**বিকাশ পার্সোনাল : ০১৯৩৩ ৩৫৫ ৯০৫**	**আর্থিক সহযোগিতা প্রেরণ করে নিশ্চিত হোন ০১৯৩৩ ৩৫৫ ৯০৫, ০১৯৩৩ ৩৫৫ ৯০১**

আরযগুযার

অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক	**ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী**
সভাপতি	সেক্রেটারী জেনারেল
বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস	বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

কেন্দ্রীয় কার্যালয় : জমঈয়ত ভবন, ৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা-১২০৪।

✆ ০২-৭৫৪২৪৩৪, ০১৯৩৩ ৩৫৫ ৯০১